বি টি রণদিভে

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ভূমিকা

Scanned with CamScanner

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ভূমিকা

বি. টি. রণদিভে

এন.বি.এ.
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

Scanned with CamScanner

BHARATER SWADHINATA SANGRAME
KOMUNISTDER BHUMIKA
B. T. RANADIVE

প্রথম সংস্করণ	:	জুলাই, ১৯৮৫
১৭তম মুদ্রণ	:	সেপ্টেম্বর, ২০০৭
১৮তম মুদ্রণ	:	সেপ্টেম্বর, ২০০৯
১৯তম মুদ্রণ	:	জুন, ২০১০
২০তম মুদ্রণ	:	আগস্ট, ২০১২
২১তম মুদ্রণ	:	আগস্ট, ২০১৩
২২তম মুদ্রণ	:	নভেম্বর, ২০১৪
২৩তম মুদ্রণ	:	সেপ্টেম্বর, ২০১৬
২৪তম মুদ্রণ	:	মে, ২০১৭

প্রকাশক :
অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২এ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

দাম : ২৫·০০ টাকা

Scanned with CamScanner

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ভূমিকা

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের যে ভূমিকা সেটা যে সাধারণভাবে শুধুমাত্র অস্বীকৃত তাই-ই নয়, ভাড়াটে লেখক ও স্বার্থান্বেষী বুর্জোয়া ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে বলে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কিছুকাল পরপরই অপবাদ এবং কলঙ্কও রটানো হয়ে থাকে।

স্পষ্টতই স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির কোন নির্ধারক ভূমিকা ছিল না। তা যদি থাকত, তবে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও বেকারি এবং সমস্ত রকম বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির শিকার কলহ-জর্জরিত এক জাতির চেহারা নিয়ে আজকের যে শোচনীয় পরিস্থিতি, ভারতীয় জনসাধারণকে তার সম্মুখীন হতে হতো না। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বের যে রাশ, তা বেশ শক্তভাবেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বের হাতেই ধরা ছিল। এমন কি কোন গণসংগ্রাম যখন, কংগ্রেস-নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেও যেত, জনসাধারণ সশস্ত্র প্রতিরোধেও প্রবৃত্ত হতো, তখনও কিন্তু এই নেতৃত্বের অনুগামী জনগণের চেতনায় কোন পরিবর্তন ঘটত না। আর সেইজন্য সংগ্রামও সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে পারত না।

বুর্জোয়া নেতৃত্ব এবং তাদের প্রচারিত শ্রেণী-দৃষ্টিবিহীন জাতীয়তাবাদী মতাদর্শই সুসঙ্গত ও সংহতি-সৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে প্রতিভাত হতো। অভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সংঘর্ষ থেকে মুক্ত একটা সুষম-প্রকৃতির সমাজ-সম্পর্কীয় মোহ নিপীড়িত জনগণের মধ্যেকার একটা সাধারণ প্রবণতা। বৈদেশিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে যখন কোন জনসমষ্টিকে সংগ্রাম করতে হয় তখন তাদের মধ্যে নিজেদের সম্পূর্ণ সুষম প্রকৃতি সম্পর্কীয় একটা মোহ সহজেই সৃষ্টি করা যায়। ইতিপূর্বে বিরাজমান সামাজিক ব্যবস্থায় দেশের পরাধীনতা কেমনভাবে জটিল — এ প্রশ্ন খুব কম লোকই উত্থাপন করেন। প্রশ্নটি যদি আদপে কখনও তোলা হয় তাহলে এই কথা বলে তাকে চেপে যাওয়া হয়, স্বাধীনতা আমরা একবার পেয়ে গেলেই এ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের ক্রিয়াকলাপ এবং বিদেশী শাসকদের সম্পর্কে তাদের ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব প্রসঙ্গে কোন রকম চিন্তা-ভাবনা করা হয় না। যাদের স্বার্থ জনগণের চূড়ান্ত লক্ষ্যের বিরুদ্ধে যায়, ও যারা জনগণের সংগ্রামের মধ্য থেকে নিজেদের সংকীর্ণ শ্রেণী-লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকে, তাদের চিহ্নিত করবার জন্য এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত পরিচালিত করে নিয়ে যাবার কাজকে তারা যাতে প্রতিহত করতে না পারে, তা সুনিশ্চিত করবার জন্য কোনও প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় না।

কমিউনিস্টরা যখনই কংগ্রেস নেতৃত্বের শ্রেণীসুলভ সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এবং যা ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ব্যাপকতাকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, জাতীয় বুর্জোয়াদের সেই আপসপন্থী স্বার্থের সঙ্গেই গান্ধীজী এবং কংগ্রেসে সংগঠনের কর্মসূচী, কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন, তখনই তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি অন্তর্ঘাতী বলে তীব্রভাবে গালাগালি

Scanned with CamScanner

করা হয়েছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপকে যে জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়েছে, সেটা ভারতের শ্রেণী-সংগ্রামেরই একটা অংশ। নিজেদের ভূমিকার তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম করে তুলবার প্রয়োজনে জনসাধারণের চেতনার মান উন্নয়নের চেষ্টায় বর্তমান জাতীয় নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটিকে খোলসা করে দিয়ে ভারতের জাতীয় সংগ্রাম সম্পর্কে একটা বিপ্লবী উপলব্ধি প্রবর্তন করতে গিয়ে, কমিউনিস্টদের এই মূল্য দিতে হয়েছিল।

ব্রিটিশ বড়লাট থেকে শুরু করে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ও জাতীয় নেতারা পর্যন্ত সবাই ছিলেন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকার। ৫৫ বছর আগে, ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড আরউইন আইনসভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, "কমিউনিস্ট মতবাদের উদ্বেগজনক প্রসারলাভ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে" এবং সরকার যে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সে কথাও ঘোষণা করেছিলেন। ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকা (১৯২৯ সালের আগস্ট), লিখেছিলেন, "বিগত দুই বৎসরের ঘটনা এটাই প্রমাণ করেছে যে, বিবেকবর্জিত কমিউনিস্ট সংগঠকদের হাতে শিল্পশ্রমিকরা এক অদ্ভুত নমনীয় উপাদান।" দক্ষিণপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ তো ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছিলেন: "সেই সময়টা এখন এসে গিয়েছে, যখন ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সংগঠন থেকে দুষ্কৃতকারীদের উৎপাটিত করে দূর করে দিতে হবে। এই হুঁশিয়ারির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আরো এই কারণে যে, এমন কতিপয় ব্যক্তি আছে যারা স্ট্রাইকের বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছে।" অবশেষে জাতীয় কংগ্রেসের মুখপত্র বম্বে ক্রনিকল পত্রিকা এই হৈ-হল্লায় যোগ দিয়েছিল এবং লিখেছিল, "আকাশে বাতাসে এখন সমাজতন্ত্রের কথা। বিগত মাসগুলিতে ভারতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সম্মেলনে বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষকদের সম্মেলনগুলিতে এই সমাজতন্ত্রের মূল নীতিগুলি প্রচার করা হয়েছে।"

আতঙ্কপূর্ণ এই সংকেতগুলির পরিণতি ঘটল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং কমিউনিস্টদের ধরপাকড়ে। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে কমিউনিস্টদের নিকৃষ্টতম দমনপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিপ্লব-অভিমুখী করে তুলতে কমিউনিস্টদের যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল, সে সব কথা খুব কম লোকেরই জানা। ১৯২০ সাল থেকে শুরু করে ১৯২৯ সালের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা পর্যন্ত পর পর যে সমস্ত ষড়যন্ত্র মামলায় কারাবাসের গুরু দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল, সেইগুলি ছাড়াও ক্রিয়াকলাপের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কমিউনিস্টদের কারাদণ্ড, আটক, নির্বাসন এবং জীবনধারণের সুস্পষ্ট কোন উপায় না থাকার অভিযোগে ও গুণ্ডা দমন আইনের কবলে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়েছিল। প্রতিটি ধর্মঘট সংগ্রামের কালেই কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে রাজদ্রোহ বা হিংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগ এবং ধর্মঘটী শ্রমিকদের দমন করা হয়েছে লাঠি, গুলির জোরে এবং কয়েদখানায় পাঠিয়ে। প্রত্যেকটি বছর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যক নেতৃবৃন্দকে জেলখানাতেই থাকতে হতো।

Scanned with CamScanner

ব্রিটিশ আমলের সমস্তটা কাল জুড়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই) একটা বে-আইনি পার্টি ছিল। ১৯৩৪ সালে বোম্বাইতে এবং ওয়ার্কার্স লীগ পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিকেও বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে, যখন কতিপয় রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ক্ষমতাসীন হলো, কেবলমাত্র তখনই এই দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পরে ১৯৪০ সালে পার্টিকে আবার আত্মগোপন করতে হয় এবং সেই সময়ে পার্টির বহুসংখ্যক খ্যাতনামা নেতাকে আটক করা হয়েছিল। ১৯৪২ সালে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানাবার পরেই একমাত্র পার্টি প্রকাশ্যভাবে কাজ করবার সুযোগ পায়।

মহারাষ্ট্র, বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ — ভারতের এরকম সর্বত্র অসংখ্য কমিউনিস্টকে বছরের পর বছর ধরে কারাগারে বা বন্দীনিবাসে আটক থাকতে হয়েছে। বাংলা ও পাঞ্জাবে বহু জনকে অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছে। অত্যাচার, গুলিবর্ষণ ও হত্যার কাজে যখন বর্বরতায় পোক্ত মালাবার স্পেশাল পুলিসকে নিয়োগ করা হয়েছিল, তখন মালাবারে একটা ব্যাপক সন্ত্রাসের অভিজ্ঞতা কমিউনিস্টদের হয়েছিল। তামিলনাড়ুর অভিজ্ঞতাও ঐ একই প্রকারের। অনেককেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, গুলি এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছিল। একটা হত্যার মামলায় মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত বীর কাইয়ুর কমরেডরা হৃদয়ে কমিউনিজমের আদর্শের প্রতি সুদৃঢ় নিষ্ঠা নিয়ে মাথা উঁচু করে এগিয়ে গিয়েছিলেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে।

একটা নজিরবিহীন দমন-পীড়নের মুখোমুখি হয়ে বাংলার কৃষকেরা ভয়াবহ এক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। আর, নিজামশাহির শেষ দিনগুলির এবং নেহরু সরকারের প্রথম দিকের দিনগুলিতে তেলেঙ্গানার কৃষকদের উপর যে বর্বর অত্যাচার চালানো হয়েছিল, তার সঙ্গে তুলনা করবার মতো কিছুই পাওয়া যাবে না।

পি সুন্দরাইয়া তাঁর 'তেলেঙ্গানার গণসংগ্রাম ও তার শিক্ষা' (Telengana People's Struggle and its Teachings) নামক বইতে লিখেছেনঃ

> "এ গণবিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার ভূমিকা যার উপর ন্যস্ত, কমিউনিস্ট পার্টির সেই বিশাল অন্ধ্র রাজ্য ইউনিট এবং তেলেঙ্গানার সংগ্রামী কৃষকদের কাছ থেকে এ সংগ্রাম প্রচণ্ড আত্মত্যাগ উৎসারিত করে নিয়েছে। তিন থেকে চার বৎসর কালব্যাপী প্রায় চার হাজার কমিউনিস্ট কর্মী ও সংগ্রামীকে বন্দী শিবিরে অথবা জেলখানায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস ধরে মারপিট, অত্যাচার ও সন্ত্রস্ত করে তুলবার জন্য অন্যূন ৫০ হাজার মানুষকে মাঝে মাঝেই পুলিস হেপাজতে এবং সৈন্যশিবিরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হাজার হাজার গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষ পুলিস ও সেনাবাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়ে নিষ্ঠুর লাঠি চালানোর যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। পুলিস ও সেনাবাহিনীর এই সব হানার ফলে লুঠ ও ধ্বংসের দরুন মানুষরা লক্ষ লক্ষ টাকার সহায়সম্পদ হারিয়েছেন। হাজার হাজার নারীর

Scanned with CamScanner

শ্লীলতাহানি ঘটেছে এবং তাঁদের নানা রকমের অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। এক কথায় পুরো পাঁচ বছর ধরে সমগ্র এলাকাটি প্রথম দিকে নিজাম ও রাজাকার এবং তাদের সশস্ত্র বাহিনীর ও পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার এবং হায়দরাবাদ রাজ্য সরকারের যুগ্ম সশস্ত্রশক্তির পুলিসী ও সামরিক শাসনের বর্বরতার শিকার হয়েছিল।"

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধি

এই সমস্ত দমনপীড়ন ও জাতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে আক্রমণ এবং জাতীয় সংবাদপত্রগুলির সহানুভূতিহীন মনোভাবের মোকাবিলা করে কমিউনিস্টরা যে দাঁড়িয়েছিলেন, তার কারণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আধেয় বিষয় ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধিতে পরিপুষ্ট তাঁদের দেশপ্রেম। তাঁদের এই সংগ্রাম যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য বিশ্বব্যাপী সংগ্রামেরই একটা অংশ ও এই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে অন্যান্য দেশেও যে শক্তিশালী সংগ্রাম চলছে — এই বোধ এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে উপলব্ধি ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের সেই আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

লেনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কমিউনিস্টরা একথাটা বুঝেছিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ধাপে ধাপে মঞ্জুরীকৃত কতকগুলি সংস্কারের মাধ্যমেও ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হবে না। অথবা, কংগ্রেস যেমন চিন্তা করে থাকে, সেই রকম শান্তিপূর্ণ পথেও তা লাভ করা যাবে না। এই আন্তর্জাতিক তাঁদের একথাই শিখিয়েছিল যে, স্বাধীনতা কেবলমাত্র গণ-সংগ্রামের মাধ্যমেই আসতে পারে এবং ভারতবর্ষের যা পরিস্থিতি, তাতে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষিসম্পর্কের অবসান ঘটাতে পারে যে কৃষিবিপ্লব, সেই কৃষিবিপ্লবই হবে এই গণ-সংগ্রামের অক্ষ। কমিউনিস্টরা এই কথাটা বুঝেছিলেন যে, সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর পথকে যদি উন্মুক্ত করা না যায়, তবে সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তি আপনা হতেই জনগণকে দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার কবল থেকে মুক্ত করতে পারবে না। অতএব কমিউনিস্টরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষে সমস্ত শ্রেণীগুলিই বিপ্লবে সমানভাবে আগ্রহী নয়। কেউ কেউ আপসেই আগ্রহী এবং কেউ কেউ ছিল যারা জনগণকে জাগ্রত করে তুলতে ভয় পায়। স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীগুলি কে কোন্ অবস্থান গ্রহণ করছে, তার ভিত্তিতেই তাঁরা নিজেদের কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করতেন।

শিল্পাঞ্চলীয় শহরগুলিতে নিজেদের জনবলজনিত শক্তির ব্যবহার এবং সাম্রাজ্যবাদী যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করে দেবার ক্ষমতা থাকার কারণে জাতীয় সংগ্রামে বিপ্লবী ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণের যোগ্যতা যে শ্রমিকশ্রেণীর রয়েছে, একথাটা কমিউনিস্টরা উপলব্ধি করেছিলেন।

কিন্তু জাতীয় আন্দোলন ও তার নেতৃবৃন্দের কাছে এ বিষয়গুলি একেবারেই অবিদিত এবং ধারণাবহির্ভূত। ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে সকলেই যে একই রকম

Scanned with CamScanner

আগ্রহী এবং ভারতীয় জনগণ যে পারস্পরিক সংঘর্ষ থেকে একেবারে মুক্ত ও সুষম প্রকৃতি-বিশিষ্ট, তাদের এই ধারণার সঙ্গে ঐ বিষয়গুলি মোটেই খাপ খায়নি। শ্রমিক ও পুঁজিপতি, জমিদার ও কৃষক সুবিধাভোগী এবং নিপীড়িত জাত বর্ণের মধ্যকার বিরোধ সম্পর্কিত কোন প্রশ্নের উল্লেখ করলেই তাকে জাতীয় সংগ্রামের সাধারণ লক্ষ্যবস্তু থেকে বিপথগামী বলে বিবেচনা করা হতো। তাঁরা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রচার করতেন। পরবর্তীকালে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের আওয়াজও তাঁদের ছিল। কিন্তু এই সমস্ত সমস্যার শ্রেণীগত উৎস কোথায় তা অনুসন্ধান করে দেখতে এবং সমস্যাগুলির সমাধানের ভিত্তি গড়ে তুলতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না।

পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি

একথা আজ শুনতে অদ্ভুত ঠেকলেও প্রায় সবগুলি আধুনিক ধ্যান-ধারণা যা আজকাল চালু এবং জাতীয় আন্দোলন কর্তৃক ক্রমশই গ্রহণ করা শুরু হয়েছে, সেই সবগুলিরই পুরোধা ছিলেন কমিউনিস্টরা এবং তাঁরাই এগুলির প্রবর্তন করেছিলেন। এটা অবশ্য সুপরিজ্ঞাত যে সমাজতন্ত্রের কথাটা কমিউনিস্টরাই সব চেয়ে আগে বলেছিলেন এবং তার সপক্ষে প্রচার করতে গিয়ে তাঁদের দীর্ঘ কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু যে কথাটা অজানা রয়ে যাচ্ছে, তা এই যে, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা ছিলেন কমিউনিস্টরাই এবং জাতীয় কংগ্রেসের সামনে তাঁরাই এটা তুলে ধরেছিলেন।

বিগত ১৯২২ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের গয়া অধিবেশন উপলক্ষে এম এন রায় কর্তৃক ইশতেহারে পূর্ণ স্বাধীনতাকেই তাদের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণের জন্য কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। তাতে লেখা হয়েছিল, "জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের নেতা হিসাবে কংগ্রেসকেই সাহস করে এই পদক্ষেপ গ্রহণের সপক্ষে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে এবং সন্দেহাতীত স্পষ্টতায় ঘোষণা করতে হবে যে, সর্বজনীন ভোটাধিকারের গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন এক জাতীয় সরকার গঠনের দাবি থেকে এতটুকুও কম নয় তাঁদের ঈপ্সিত লক্ষ্যবস্তু।" কিন্তু এই লক্ষ্য থেকে কংগ্রেসের অবস্থান বহুদূরে ছিল। 'স্বরাজ'-এর দাবির বেশি একটুকুও তাঁরা এগোতে চাননি এবং এই পর্যায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে তাঁদের কোন ইচ্ছাই ছিল না। বস্তুত জাতীয় কংগ্রেসের আহ্‌মেদাবাদ অধিবেশনে (১৯২১ সালে) হজরত মোহানি যখন তাঁর উত্থাপিত এক প্রস্তাবে "স্বরাজ" কে "সমস্ত রকম বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত এক পূর্ণ স্বাধীনতা" বলে ব্যাখ্যা করলেন, তখন গান্ধীজী এই কথা বলে তার বিরোধিতা করলেন যে, "আমি এজন্য আহত বোধ করছি যে, এই প্রস্তাব দায়িত্বজ্ঞানের অভাব সূচিত করছে।"

সমান অংশীদারির যে তত্ত্ব থেকে বুর্জোয়া নেতৃত্ব এতটুকুও বেশি এগোতে সাহস করত না, সেই তত্ত্ব-সম্পর্কীয় মোহ থেকে কংগ্রেস নেতৃত্বকে মুক্ত করবার প্রয়াস কমিউনিস্টদের গয়া ইশতেহারে করা হয়েছিল। ইশতেহারে বলা হয়েছিল "ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থেকে সমান অংশীদারির তত্ত্বটি সাম্রাজ্যবাদেরই একটি

Scanned with CamScanner

গিল্‌টিকরা সংস্করণ ছাড়া কিছু নয়। এই তত্ত্বের আড়ালে যে মতলব, সেটা হচ্ছে কিছু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাদানের মাধ্যমে দেশীয় জমিদার শ্রেণীর সমর্থন আদায় করা ও দেশের শোষণে তাদের ছোট শরিক হিসাবে ঠাঁই দেওয়া। এর দ্বারা আমাদের সমাজের উচ্চতর শ্রেণীভুক্তরাই কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে পেতে পারে মাত্র।"

গান্ধীজীর একদা অতি প্রিয় 'হৃদয়ের পরিবর্তন'-এর সেই প্রবঞ্চনা ও আত্মসমর্পণমূলক তত্ত্বটির মুখোশ ঐ ইশতেহারটিতে খুলে দেওয়া হয়েছিল। — "ব্রিটিশ শাসকদের 'হৃদয়ের পরিবর্তন' সম্পর্কীয় তত্ত্বটির প্রচারে যাঁরা রত, তাঁরা এই সমস্ত আধাখেঁচড়া ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারগুলি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের একটা আপস যে সম্ভব, এই তত্ত্বটিতে তার স্বীকৃতি আছে। সুতরাং তত্ত্বটি বিপজ্জনক এবং কংগ্রেসকে এর কবল থেকে মুক্ত করা অবশ্য কর্তব্য। এই যে দ্ব্যর্থবোধক অবস্থান এবং লক্ষ্যসম্পর্কীয় অস্পষ্টতা, তা কংগ্রেসের বিগত বারো মাসের কার্যকলাপের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও দোদুল্যমানতা বৈশিষ্ট্যকেই পুষ্ট করেছে। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় ভারতীয় জনগণের যে সংকল্প-দৃঢ় সংগ্রাম তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত একটা কর্মসূচীর উপরই নির্ভরশীল। কেবলমাত্র এই রকম একটা কর্মসূচীই জনগণকে ব্যাপক আকারে জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনতে পারে। কারণ জনসাধারণের জীবনকে প্রভাবিত করে, এমন সব অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি এতে বিবেচ্য বলে গণ্য হয়।"

বিগত ১৯২১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের আহ্‌মেদাবাদ অধিবেশনকালে প্রচারিত কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহারে বলা হয়েছিল, "ভারতবর্ষকে তার মূল ভিত্তি সমেত যা কাঁপিয়ে দেয়, সেই রকম বিপ্লবে যদি কংগ্রেস নেতৃত্ব দিতে চায় তবে শুধুমাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন বা উন্মাদনাপূর্ণ সাময়িক, উদ্দীপনার উপরই যেন তাঁরা নির্ভর না করেন। ট্রেড ইউনিয়নসমূহে এই মুহূর্তের দাবিগুলিকে তাঁরা নিজেদের দাবি হিসেবে তুলে ধরুন, কিসানসভার কর্মসূচীকে তাঁদের নিজেদের কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করুন। তা করা হলে, এমন সময় আসবে যখন কোন বাধার সম্মুখেই কংগ্রেসকে থেমে যেতে হবে না। নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্য সচেতনভাবে সংগ্রাম করছেন এমনই একটা সমগ্র জনসমষ্টির অপ্রতিরোধ্য শক্তি দ্বারা তাঁরা সমর্থিত হবেন।"

এটা দেখা যাবে যে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সবচেয়ে অগ্রগামী ও বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণা এবং কর্মসূচী কমিউনিস্টদের ছিল এবং তাঁরাই জাতীয় আন্দোলনের মধ্যকার দুর্বলতা ও বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির অভাবকে কাটিয়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। তবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব কর্তৃক তাঁদের এই সমস্ত সমালোচনা ও পরামর্শগুলি প্রত্যাহার এবং প্রত্যাখ্যাত দুটোই হতো।

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সম্পূর্ণ কর্মসূচীসহ সংগ্রামের একটা নিজস্ব কর্মপন্থা বিগত ১৯৩০ সাল নাগাদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি উপস্থিত করেছিল। পরবর্তীকালে

Scanned with CamScanner

১৯৩৪ সালের এক পার্টি প্লেনামে এটাকেই আরো বিশদ করে তুলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সংগ্রামের কর্মপন্থায় এই দলিলের বিষয়বস্তু এটাই উদ্‌ঘাটিত করে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতীয় সমাজের সমস্ত প্রাণবন্ত উপাদানগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি মাত্র প্রবল শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার বৈপ্লবিক কর্মসূচী একমাত্র এই কমিউনিস্ট পার্টিরই ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

এটা সুপরিজ্ঞাত যে, জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ জমিদার ও সামন্ততান্ত্রিকদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতেই কাজ করতেন এবং কৃষিবিপ্লবের জন্য কৃষক সমাজকে জাগ্রত করে তোলার কথা চিন্তা করতেন না। একটা মূল ও বৃহৎ উৎসকে অসংহত করে রেখেছিলেন। জাতীয় ঐক্য, সম্প্রীতি এবং অস্পৃশ্যতার অবসান সম্পর্কে অনেক কথা বলা সত্ত্বেও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতারা কিন্তু জাতপাত বোধ এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদকে জিইয়ে রাখে যে সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেননি। তিলকের মতো কতিপয় কংগ্রেস নেতা তো প্রকাশ্যভাবেই জাতপাতভেদকে সমর্থন করতেন। অস্পৃশ্যতার অবসান যে খুব জরুরি, এ সমস্ত কথা বললেও গো-রক্ষা, অবতারবাদ এবং বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হিসেবে গান্ধীজী নিজেকে একজন সনাতনী বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই সমস্ত বিষয়ে নেহরুর ধ্যান-ধারণা উন্নত ধরনের হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসে গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রাধান্য ছিল।

গান্ধীজীর একজন পরম বিশ্বস্ত অনুগামী জগজীবন রাম তাঁর 'কাস্ট চ্যালেঞ্জ ইন ইন্ডিয়া' নামক পুস্তকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা থেকে নিম্নলিখিত অংশটির উল্লেখ করলে এ সব ব্যাপারে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ সেটা বোঝা যেতে পারে: "যদি অস্পৃশ্যতাকে আমরা মুছে না ফেলি, তাহলে পৃথিবী থেকে আমরাই মুছে যাব।..... বর্ণচতুষ্টয় হচ্ছে মৌলিক জিনিস, এছাড়া অসংখ্য যেসব জাত উপজাত, সেগুলি বাড়তি আগাছা মাত্র..... সত্যকার মিতব্যয়িতা ও মানবীয় শক্তির সংরক্ষণশীলতা সম্পর্কীয় প্রকৃতির নিয়ম বর্ণই পালন করে থাকে..... এটা বিভিন্ন পদ্ধতির আত্মোন্নয়ন চর্চারই শ্রেণীবিভাজন। সামাজিক সুস্থিরতা ও প্রগতির এটাই সম্ভাব্য সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। জীবনে বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্পর্কীয় একই নির্দিষ্ট উপায়াবলম্বী পরিবারসমূহকে এই ব্যবস্থা তার অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট। এতে কোন্ পরিবার কোন্ বর্গের বলে গণ্য হবে, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারটাই শুধু কতিপয় ব্যক্তির খেয়াল বা স্বার্থ-প্রণোদিত বিচারবুদ্ধির উপর ছেড়ে দেওয়া হয় না। বর্ণ-বংশানুক্রমের নীতিতে বিশ্বাসী এবং কেবলমাত্র উৎকর্ষ সাধনই এই ব্যবস্থার ভিত্তি হওয়ায় কোনো ব্যক্তি জীবনযাপনের শ্রেয়তর উপায়ের সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি তাকে পরিবার বা গোষ্ঠীবিশেষের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে হয়, তবে তাকে অবিচার বলে এতে মনে করা হয় না। সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আসে খুবই ধীরে এবং জীবনের এই পরিবর্তনের উপযোগী নতুন গোষ্ঠীবন্ধনের প্রক্রিয়াকেও জাতপাত ব্যবস্থা সম্মতি

Scanned with CamScanner

দিয়েছে। মেঘের আকৃতির পরিবর্তনের মতো এই পরিবর্তনগুলিও নিঃশব্দে ও সহজে ঘটে। এর চেয়ে সুসঙ্গতিপূর্ণ সমন্বয় সাধনের কথা কল্পনা করা কঠিন। জাতপাত কোনো উন্নাসিকতা বা হীনমন্যতা সূচিত করে না। এটা শুধু বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও তারই অনুরূপ জীবনধারণের পদ্ধতিগুলিকে স্বীকার করে থাকে মাত্র। জাতপাত হচ্ছে বিভিন্ন সংস্কৃতিগত প্রথার একটা শ্রেণী-বিভাজন। এটা পারিবারিক নীতিরই একটা সম্প্রসারণ। এই উভয় বিষয়ই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে রক্তের সম্পর্ক এবং বংশানুক্রমের দ্বারা। অর্থনৈতিক বিচারের দিক থেকে এর মূল্য অতীব উচ্চ। বংশানুক্রমিক দক্ষতা এর দ্বারা সুনিশ্চিত। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র এর দ্বারা সংকুচিত। নিঃস্বতার প্রতিবিধানের এটা একটা উপায়। ব্যবসায়গত গিল্ড গড়ে ওঠার সুযোগ এতে ছিল। ভারতীয় সমাজের গবেষণাগারে মানুষের কাছে এটা ছিল সামাজিক সমন্বয় গড়ে তোলা সম্পর্কীয় একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এর সাফল্য যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি, তাহলে হৃদয়হীন প্রতিযোগিতার একটা সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিবিধান হিসাবে এবং ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম, এমন একটা শক্তি হিসাবে বিশ্বের হাতে একে আমরা তুলে দিতে পারি। বর্ণ মনুষ্য-প্রকৃতিরই অন্তর্নিহিত। হিন্দুধর্ম তাকে একটা বিজ্ঞানে পরিণত করেছিল কিন্তু বর্তমানে জাতপাত একটা বিকৃতিতে পর্যবসিত। এর অবসান ঘটানোর আগ্রহে মূল বিষয়টিকেই যেন আমরা বিসর্জন দিয়ে না বসি — কারণ এটা মানুষের কোনো উদ্ভাবন নয়, প্রকৃতিরই এটা পরিবর্তনাতীত নিয়মমাত্র। এটা সেই প্রবণতারই একটা ঘোষণা, যা সব সময়েই বিরাজ করছে এবং নিউটনের অভিকর্ষ-সম্পর্কিত নিয়মের মতোই কাজ করে চলেছে।

জাতপাত ও বর্ণাশ্রমের সমর্থনে এর চেয়ে খোলাখুলি ও গোঁড়ামিপূর্ণ আর কিছু থাকতে পারে না। জাতপাতের পক্ষপাতী জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, হিন্দু গোঁড়ামির এই যে তুষ্টিসাধন, সেটা সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের সঙ্গে বুর্জোয়া নেতৃত্বের আপসরফারই একটা অঙ্গস্বরূপ। এ জন্যই শেষ পর্যন্ত এই দৃষ্টিভঙ্গিই কাজ করে গেছে ও অবশেষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে ব্যর্থতা ডেকে নিয়ে এসেছে, যার পরিণতি ঘটেছে দেশ-বিভাগে।

কমিউনিস্ট কর্মপন্থা

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে রচিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপন্থা এই বুর্জোয়া সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছেদ ঘটাল এবং জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সাফল্যের প্রশ্নটিকে সংযুক্ত করল কৃষিবিপ্লব ও পুরনো সামাজিক ধর্মীয় ব্যবস্থা কর্তৃক আরোপিত সমস্ত বৈষম্যের অবসানের সঙ্গে। সমস্ত বংশপরম্পরাজাত বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই কর্মপন্থা সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং জনগণের সমস্ত অংশের প্রতি মুক্তির জন্য সংগ্রামে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে সেই বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করল। ভারতীয় জনসাধারণের সমস্ত অংশের সমস্যাবলী সম্পর্কে সরাসরি উল্লেখ করে এবং

Scanned with CamScanner

ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদকল্পে বিপ্লবী সংগ্রামের সমূহ প্রয়োজনের কথা তুলে ধরে, এরকম কোনও বিপ্লবী দলিল ভারতবর্ষ ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি।

ঐ কর্মপন্থায় ঘোষণা করা হয়েছিল: "ভারতীয় জনসাধারণের দাসত্ব বন্ধনের উচ্ছেদ ঘটাতে হলে এবং যে দারিদ্র্যের কবলে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকেরা নিষ্পেষিত, তা থেকে তাদের মুক্ত করতে হলে দেশের স্বাধীনতা অর্জন, এবং যা মধ্যযুগ থেকে এ যাবৎ জিইয়ে রাখা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে দিতে ও সমগ্র ভূখণ্ডকে যাবতীয় মধ্যযুগীয় আবর্জনা থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ, সেই কৃষিবিপ্লবের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরা একান্তভাবে আবশ্যক। ব্রিটিশ পুঁজি ও জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক কৃষিবিপ্লবকেই হতে হবে ভারতে সেই বৈপ্লবিক মুক্তি অর্জনের ভিত্তি।"

কংগ্রেস বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি যে সমস্ত বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন তা থেকে এটা ছিল সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন প্রকৃতির। সমস্ত ব্রিটিশ অধিকৃত কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, সমুদ্র ও নদী পরিবহণ ব্যবস্থা ও বাগিচা শিল্পের বাজেয়াপ্ত ও জাতীয়করণের দাবি ঐ কর্মপন্থায় ঘোষণা করা হয়েছিল। এতে দেশীয় রাজ্য সমূহের অবসান এবং বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদার, রাজন্যবর্গ, গির্জা ও ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারীদের অধিকৃত সমস্ত জমি, সমভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানানো হয়েছিল। এতে দাসখত এবং ব্যাঙ্ক ও মহাজনী ঋণসমূহ নাকচ করে দেবার দাবি রাখা হয়েছিল। এই কর্মপন্থায় আট ঘন্টার শ্রমদিবস এবং শ্রমিকদের অবস্থার আমূল উন্নয়নমূলক পরিবর্তনের দাবিও করা হয়েছিল।

এই দাবিগুলি, বিশেষ করে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের দাবিটি কখনই ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। একইভাবে ব্রিটিশ সংস্থাগুলি জাতীয়করণের দাবি উত্থাপনেও কংগ্রেস নেতারা সাহস করেননি। বিগত ১৯৩০ সালের সংগ্রামকালে গান্ধীজীর যে এগারো দফা কর্মসূচী ছিল, তাতেও এই দাবিগুলির একটিকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কৃষক সমাজ সম্পর্কে যে দাবিটি এতে করা হয়েছিল, তাও ছিল জমির রাজস্ব ও খাজনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হ্রাস করা সংক্রান্ত। গান্ধীজীর এগারো দফা কর্মসূচীর সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্ব্যর্থহীন কর্মসূচীর যদি তুলনা আমরা করি, তাহলে অধিকার সমর্পণও আপসরফার উদ্দেশ্যে রচিত এক কর্মসূচী এবং একটি বিপ্লবী সংগ্রামের কর্মসূচীর মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা আমরা দেখতে পাই।

শ্রেণী-সংগ্রাম বনাম সমাজ-সংস্কার

"ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী শ্রমিকদের একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে সংঘর্ষের প্ররোচনা যারা দেয়, সেই ব্রিটিশ সরকার ও দেশীয় শোষকদের ধূর্ততাপূর্ণ প্ররোচনামূলক পদ্ধতি দ্বারা প্রতারিত না হবার" জন্য হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ঐ কর্মপন্থা অস্পৃশ্যতা ও জাতপাত প্রথার প্রকাশ্য নিন্দা করেছিল এবং এই সমস্ত প্রথার উচ্ছেদকে সংযুক্ত করেছিল ভারতের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদের সঙ্গে। এই প্রশ্নগুলিকে কংগ্রেস

Scanned with CamScanner

নেতারা বড় জোর হিন্দুদের সামাজিক সংস্কারের প্রশ্ন হিসেবে দেখতেন। অস্পৃশ্যদের মধ্য থেকে আগত জঙ্গী নেতারাও তাদের সংগ্রামকে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং এইভাবে তারাও সমস্যাটিকে প্রকৃতপক্ষে একটা সমাজসংস্কারের প্রশ্নে পর্যবসিত করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি এই সংস্কারপন্থী ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তাঁদের কর্মপন্থা ঘোষণা করেছিলেন।

আমাদের দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবস্থানহেতু এখনও সমস্ত রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস এবং সমাজের অপাঙক্তেয় কোটি কোটি কর্মরত পারিয়ার অস্তিত্ব রয়ে গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, প্রতিক্রিয়াশীল জাতপাত-প্রথা, ধর্মীয় প্রবঞ্চনা এবং অতীতের সমস্ত দাস ও ভূমিদাসসুলভ রীতিনীতি ভারতীয় জনসাধারণের টুঁটি চেপে ধরে রেখে তাঁদের মুক্তির পথ অবরোধ করে রেখেছে। এ সমস্তের পরিণতি এখানেই এসে ঠেকেছে যে এই বিংশ শতাব্দীতেও ভারতবর্ষে এখনো এমন পারিয়া রয়েছেন, সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবার, একই কুয়ো থেকে জলপান করবার, বা একই স্কুলে পড়বার ইত্যাদি কোনও অধিকার যাঁদের নেই।

ভারতীয় জনসাধারণের জীবন থেকে এই লজ্জাজনক কলঙ্ক চিরদিনের জন্য ঘুচিয়ে দেবার পরিবর্তে গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা সামাজিকভাবে অপাঙক্তেয় পারিয়াদের অস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি ও ভিত্তিস্বরূপ এই যে জাতপাত প্রথা তাকেই বজায় রাখবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। একমাত্র জাতপাত প্রথার নির্মম উচ্ছেদসাধন, কৃষিবিপ্লব এবং বলপূর্বক ব্রিটিশ শাসনের উৎখাতই কর্মরত পারিয়াদের ও দাসদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগতভাবে মুক্তি এনে দিতে পারে। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ শাসন এবং জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত শ্রমিকদের সঙ্গে এক হয়ে বৈপ্লবিক যুক্তফ্রন্টে যোগদানের জন্য সকল পারিয়াদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি দাসত্ব, জাতপাত-প্রথা এবং সমস্ত ধরনের (সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি) বর্ণ বৈষম্যের সম্পূর্ণ অবসানের জন্য সংগ্রাম করে। দেশের সমস্ত মেহনতী মানুষ ও কর্মরত পারিয়াদের জন্য সম্পূর্ণ ও নির্ভেজাল কমিউনিস্ট পার্টিই সংগ্রাম করে।

এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ঐ কর্মপন্থা পদমর্যাদা, বর্ণ, জাতি ও সম্প্রদায়গত সুবিধাভোগের বিলোপ এবং নারী-পুরুষ, ধর্ম ও গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার দাবি করেছিল, এ কর্মপন্থা রাষ্ট্র থেকে ধর্মের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ দালাল হিসাবে মিশনারিদের সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণসহ বিতাড়ন দাবি করেছিল।

ভারতবর্ষে এই কমিউনিস্ট কর্মপন্থাই সর্বপ্রথম শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগ্রামের সঙ্গে ভারতের সংগ্রামকে যুক্ত করেছিল এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত আন্তর্জাতিক আন্দোলন যে সমস্ত মানুষের এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধেই সংগ্রামে রত

Scanned with CamScanner

ও মহান অক্টোবর বিপ্লব যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল, সেই বিষয়ে মানুষকে অবহিত করেছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ সত্য কথাটি জনগণের মধ্যে প্রচার করায়, শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসক কর্তৃকই নয়, কতিপয় কংগ্রেস নেতা কর্তৃকও কমিউনিস্টদের মস্কোর দালাল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই অবশ্য নেহরুর প্রভাবে জাতীয় কংগ্রেসকেও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অগ্রগতিকে হিসেবের মধ্যে গণনা করতে হয়েছিল এবং ১৯৪২ সালের বিগত আগস্ট মাসে গৃহীত এক প্রস্তাবে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণের জন্য তাঁরা উদ্বেগও প্রকাশ করেছিলেন।

ঐ কর্মপন্থায় লেখা হয়েছে: "ভারতীয় জনগণের সংগ্রামে ভারতীয় জনগণ একলা নন। তাঁদের মিত্র রয়েছেন বিশ্বের সমস্ত দেশের বিপ্লবী শ্রমিকদের মধ্যে। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদসাধনের জন্য এবং যে পুঁজিবাদ গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে সেই পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকগণ সংগ্রাম করে চলেছেন। যে বিশ্বসংকট সমস্ত রকম সংঘাতকে প্রচণ্ডভাবে তীব্রতর করছে এবং যুদ্ধকে আসন্ন ও বিপ্লবী সংগ্রামের নতুন এক তরঙ্গের অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করছে, সেই সংকটের সঙ্গে ভারতে সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থার সংকটও বর্তমানে জড়িত হয়ে পড়েছে — বিশ্বের একটি দেশ সোভিয়েত রাশিয়ায় বহুদিন পূর্বেই শ্রমিকশ্রেণী শোষকদের ক্ষমতার উচ্ছেদ সাধন করেছে এবং সেখানে সাফল্যের সঙ্গে এক সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রাষ্ট্র গড়ে তুলছেন। ভারতবর্ষের মেহনতী মানুষসহ বিশ্বের সমস্ত ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের এক নির্ভরযোগ্য মিত্র হচ্ছে এই সোভিয়েত ইউনিয়ন। সমস্ত দেশের বিপ্লবী শ্রমিকবৃন্দের কাছ থেকে বিশেষ করে অগ্রসরমান চীন বিপ্লবের কাছ থেকে ভারতের মেহনতী জনগণ সমর্থন লাভ করবেন। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত গ্রেট ব্রিটেনের বিপ্লবী শ্রমিকবৃন্দ কর্তৃকও ভারতবর্ষের মেহনতী জনগণ সমর্থিত হবেন।"

একথাটাও অবশ্যই একই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, ঐ কর্মপন্থায় ভারতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে একটা বেঠিক ও ভুল ধারণা থেকে গিয়েছিল। চীনের চিয়াং কাইশেক-এর বিশ্বাসঘাতকতা আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তার ফলে ষষ্ঠ কংগ্রেসের (কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল) দলিলে সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও, বুর্জোয়ারা ইতিমধ্যেই সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে — একথাটাই বস্তুত ঘোষণা করে দেওয়া হলো। এটা বিগত ১৯৩০ সালে আমাদের সংকীর্ণতাবাদী মনোভাবের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল এবং পার্টির বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচী সম্পর্কে এক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে জনগণের মধ্যে তার ভাবমূর্তির প্রচণ্ড ক্ষতি করল। পার্টি অবশ্য এই ভুলগুলির সংশোধন করে এবং বিগত ১৯৩৪ সালে যখন কর্মসূচী সম্পর্কীয় দলিল গ্রহণ করা হয় তখন এইসব ভুলের আর পুনরাবৃত্তি ঘটেনি।

ঐ কর্মপন্থার দ্বিতীয় ভুলটি ছিল যে তাতে গণপরিষদভিত্তিক উত্তরণকালীন

Scanned with CamScanner

কোনো রাষ্ট্রীয় অবয়বের ঠাঁই ছিল না। এতে শুধুমাত্র এক সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথাই বলা হয়েছিল।

কিন্তু এই সমস্ত ভুল সত্ত্বেও জাতীয় মুক্তি সংক্রান্ত এমন একটা বৈপ্লবিক উপলব্ধি ও কর্মসূচীর অস্ত্রে কমিউনিস্ট পার্টি সুসজ্জিত ছিল, যা ভারতীয় সমাজের শ্রেণীভিত্তিক বাস্তবতার উপরই ছিল প্রতিষ্ঠিত।

নিজস্ব গণভিত্তি

কর্মপন্থা প্রকাশিত হবার কয়েক বছর আগে থেকেই জনগণকে সংগঠিত করার কাজ কমিউনিস্টরা শুরু করে দিয়েছিল। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসের যে 'উপনিবেশ সম্পর্কীয় নিবন্ধ' তার বৈপ্লবিক উপলব্ধি দ্বারাই জনগণের মধ্যে তাদের কার্যকলাপের ধারা পরিচালিত হতো। বৈপ্লবিক মতাদর্শ ও বৈপ্লবিক পার্টির সরাসরি প্রবেশ লাভ সম্ভব, এমন নিজস্ব গণভিত্তি গড়ে তোলার প্রথম প্রচেষ্টার শুরু এখান থেকেই। ক্রমবর্ধমান সংকট এবং শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট সংগ্রামের ঐ জোয়ারের সময়ে সক্রিয়ভাবে গণ-আন্দোলন আরম্ভ করতে কমিউনিস্টরা শ্রমিক, কৃষক এবং যুবকদের মধ্যে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছিল। শীঘ্রই তারা এমন একটা শক্তি হয়ে উঠল, যারা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অত্যন্ত বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচিত হলো এবং এ কারণে আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠল।

কিন্তু কমিউনিস্টরা একটা গণশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে ওঠা অবধি সরকার আর অপেক্ষা করল না। বিপদ ক্রমবর্ধমান দেখে কমিউনিস্ট ভাবধারা মানুষের কাছে গিয়ে পৌছুবার অনেক আগেই তার সমস্ত অভিব্যক্তিকে দমন করতে তারা সচেষ্ট হলো। পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা এবং কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা, যাতে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, শওকত ওসমানি, এস এ ডাঙ্গে এবং দাশগুপ্ত (নলিনী গুপ্ত,যার প্রকৃত নাম নলিনী দাশগুপ্ত) অভিযুক্ত হয়েছিলেন, সেগুলি সবই ছিল সামাজতান্ত্রিক ভাবধারার জাগরণকে দমন করবার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক প্রচেষ্টা।

কিন্তু দমন-পীড়ন সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সম্প্রসারণকে রোধ করতে পারেনি। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার পরে গান্ধীবাদ সম্পর্কে যাঁরা মোহমুক্ত হয়েছিলেন সেইসব যুবকদের মনে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া সংক্রান্ত খবরাখবর, ব্রিটিশ শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট (১৯২৬ সাল) সহ বিদেশের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনসমূহ ক্রমশই বেশি বেশি করে ছাপ ফেলতে শুরু করেছিল। যুবকদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ সেই সময়ে যদি বা সাময়িকভাবে হীনমনোবল হয়ে থাকেন, এমনকি রাজনৈতিক বোধ হারিয়েও থাকেন এবং আর একটি অংশ পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদের দিকে ঝুঁকে থাকেন, তাঁদের একটি অংশ কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের এড়িয়ে স্বাধীনভাবে, মার্কসীয় মতাদর্শ থেকে উৎসাহিত জনগণের প্রতি যে বিশ্বাস তাই নিয়ে তাদের সংগঠিত করতে সুনিশ্চিতভাবেই ব্রতী হয়েছিলেন। একটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন শ্রমিক ও কৃষক পার্টির অবির্ভাব ঘটল এবং তা জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত জঙ্গী কর্মীদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের একতাবদ্ধ করল।

Scanned with CamScanner

এর জন্য একটি বৈপ্লবিক কর্মসূচী উপস্থিত করবার যে উদ্যোগ তা কমিউনিস্টরাই গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা এবং কৃষিবিপ্লবের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এমনই একটি ব্যাপকতর সংগঠন হতে হয়েছিল শ্রমিক ও কৃষক পার্টিকে। বিগত ১৯২৬ সালে বাংলাতেই সর্বপ্রথম শ্রমিক ও কৃষক পার্টি গঠিত হয়েছিল। শীঘ্রই অনুরূপ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে। এরাই সারা ভারত শ্রমিক ও কৃষক পার্টির মধ্যে মিলিত হয়ে তাদের প্রথম কংগ্রেসের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করল ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে।

সারা ভারত শ্রমিক ও কৃষক পার্টির কংগ্রেস ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য এক সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। এই প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছিল যে, সংগ্রামের সাফল্যের প্রয়োজনে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে এবং এ জন্য কৃষক ও যুবকদের মধ্যে সক্রিয়তা বৃদ্ধি করতে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

বিগত ১৯২৬ সাল থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে চিত্র, তার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। শ্রমিকশ্রেণীই যে সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী, সেকথা জেনে এবং জাতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামে নেতৃত্বের ভূমিকা পালনের যোগ্যতা যে তাদেরই সে বিষয়ে সুনিশ্চিত থাকা কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্ব সহকারে এই শ্রেণীটিকেই সংগঠিত করবার কাজে ব্রতী হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের চেতনায় আমূল পরিবর্তন এবং কৃষিবিপ্লবের জন্য সংগ্রামের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়াই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের হাতিয়ারস্বরূপ হয়ে উঠেছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের অগ্রগতি

সময়টা তখন ছিল অনুকূল। বিগত ১৯২৬ সালের যে সময়ে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়ে গেল সেই সময়ে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীকে অত্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে একটানা এবং বিশাল ধর্মঘট পরিচালনা করতে ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর মতো কাজ করতে দেখা গিয়েছিল। আকস্মিক, ক্ষিপ্র অথচ স্বল্পকাল স্থায়ী সংগ্রামের ইতিপূর্বেকার যে প্রাথমিক পর্যায়, তার পরিবর্তে এখন দীর্ঘ একটানা সংগ্রাম চলতে থাকল। খড়গপুর ও লিলুয়ায় রেল শ্রমিকদের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট, — লিলুয়ার ধর্মঘটকালে পুলিসের গুলিতে দুইজন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছিল — সমগ্র দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়ে জুড়ে দশ দিনের এক জঙ্গী ধর্মঘট ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য দেশব্যাপী প্রস্তুতির মাঝখানেই জি আই পি রেলওয়েতে ধর্মঘট, বোম্বাইয়ের সমগ্র বস্ত্রবিকাশে ১৯২৮ সালের ২৬শে এপ্রিল তারিখের ধর্মঘট যা প্রায় ৬ মাস ধরে চলেছিল, ১৯২৯ সালে বস্ত্রশিল্পে দ্বিতীয় ধর্মঘট — এইগুলিই ছিল সেইকালের কতিপয় খুবই দীর্ঘস্থায়ী, জঙ্গী ও অনন্যসাধারণ ধর্মঘট।

কংগ্রেস সংগঠনের আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রামের প্রতি, হয় প্রকাশ্যভাবে বিরূপমনোভাবাপন্ন ছিলেন অথবা সরকার পক্ষ থেকে যখন সেগুলি

Scanned with CamScanner

দমন করা হতো তখন তারা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতেন। ভারতের উঠতি পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিভূ হিসেবে এরা শ্রমিকদের যে কোনও শ্রেণীসুলভ কার্যকলাপকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন। বোম্বাইয়ের সুতাকল ধর্মঘট ভারতের সুতাকল মালিকদের স্বার্থের সরাসরি বিঘ্ন সৃষ্টি করায় এবং এই মালিকদেরই কতিপয় আবার কংগ্রেসের আর্থিক পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় এরা এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে খোলাখুলি ও বিশেষ রকমের বৈরিতা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্রমিকশ্রেণীর এই সমস্ত নতুন ধরনের সংগ্রাম যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণেরই ফলশ্রুতি এবং ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধেই যে এই শ্রমিকরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত, জাতীয় নেতৃত্ব সেই কথাটাই স্বীকার করতে অসম্মত ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রস্তুত করে তুলতে এরা অস্বীকার করতেন এবং এভাবেই তারা এই প্রাণবন্ত শ্রেণীর বৈপ্লবিক শক্তির অপচয় ঘটাতেন।

কিন্তু, বিকাশোন্মুখ এই ধর্মঘট সংগ্রামগুলির বিপুল তাৎপর্যের বিষয়টি উপলব্ধি করে এইগুলি সংগঠিত করবার প্রচেষ্টাকে তীব্রতর করতে এবং এই সমস্ত সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের একটি শক্তিশালী বাহু হিসেবে শ্রমিকদের গড়ে তুলতে কমিউনিস্টরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ এবং অন্যান্য কতিপয় শিল্পকেন্দ্রে এই ধর্মঘট-তরঙ্গের উত্থান পরিলক্ষিত হয়েছিল। এরকম বহু সংখ্যক সংগ্রামে বাম জাতীয়তাবাদীদের পাশাপাশি কমিউনিস্টরা পার্টি হিসেবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কি বিপুল অভ্যুত্থানকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে যে অবহেলা করা হয়েছিল তা কতিপয় হিসেব থেকে ধারণা করা যেতে পারে। বিগত ১৯২৮ সালে ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী মেহনতি মানুষের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং নষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা গিয়ে ঠেকেছিল তিন কোটি দশ লক্ষে। পরের বছর, অংশগ্রহণকারী ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার এবং নষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হলো এক কোটি বিশ লক্ষ। আর এই দুইটি বছর ধরে কংগ্রেস শুধু ডমিনিয়ন স্ট্যাটাসের কথাই বলে চলেছিল। অথচ, তখন ১৯৩০ সালের সংগ্রাম শুরু হতে মাত্র এক বৎসর দেরি। জনগণের অন্যান্য অংশ সংগ্রামে নেমে পড়বার আগেই শ্রমিকশ্রেণীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে সরকার তখন বদ্ধপরিকর।

অগ্রগামী সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল ছিল বোম্বাই। এখানেই ছিল সেইসব কমিউনিস্ট গ্রুপ যাঁদের সকলেরই পরবর্তীকালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বিচার হয়েছিল এবং যাঁরা তৎকালে পুরনো সংস্কারবাদী নেতাদের অপসারিত করে ক্রমে ক্রমে হাজার হাজার শ্রমিকের কাছে বরেণ্য ও স্বীকৃত নেতা হয়ে উঠেছিলেন। গিরনি কামগড় ইউনিয়নের মতো একটি জঙ্গী সংগঠন কমিউনিস্টরাই তৈরি করেছিলেন। মাত্র ৩২৪ জন সদস্য নিয়ে যার শুরু সেই বছরেই ডিসেম্বর মাসে তার সদস্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল পাঁচ হাজার চারশ'। আর ১৯২৯ সালের প্রথম তিন মাসে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল সাড়ে ছয় হাজার।

Scanned with CamScanner

বিশাল বিশাল ইউনিয়ন গঠনে কমিউনিস্টরা সফল হয়েছিলেন। তাঁরা অসংখ্য ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সাধারণতন্ত্র এবং শ্রমিক ও কৃষকের সরকার ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সাধারণতন্ত্র এবং শ্রমিক ও কৃষকের সরকার গঠনের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখে তাঁরা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রচার করেছিলেন। জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে শক্তিশালী করে তুলবার জন্যে তাঁরা বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিবাদ ও ধর্মঘট সংগঠিত করেছিলেন। যেদিন সাইমন কমিশন এসে বোম্বাই বন্দরে পদার্পণ করেছিল সেদিন বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের যে পূর্ণ ধর্মঘটে রেলওয়ে, সুতাকল ও পৌরসভার শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করেছিলেন সেই ধর্মঘট জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বানে কমিশন বর্জনের জন্য বিপুলাকার জাতীয় আন্দোলনেরই অংশ হয়ে উঠেছিল। এক নতুন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা শ্রমিকদের মন কেড়ে নিয়েছিল এবং তারা এমন এক স্বতন্ত্র নেতৃত্বে সমবেত হচ্ছিলেন — যে নেতৃত্ব মতাদর্শগত ব্যাপারে জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী ছিল না। অনুরূপ সাফল্য কিছু পরিমাণে কলকাতা ও অন্যান্য কয়েকটি শিল্প শহরেও অর্জন করা গিয়েছিল। বোম্বাইয়ের মতো একইভাবে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট পরিচালনার মধ্য দিয়েই কলকাতাতেও কমিউনিস্ট নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল।

বোম্বাই ও অন্যত্র কমিউনিস্টদের যে সাফল্য তার কারণ ছিল জনগণের উপর তাঁদের আস্থা এবং নির্ভরশীলতা। কমিউনিস্টরা যে শুধু জঙ্গী নেতার সরবরাহে যোগান দিয়েছিলেন তাই নয়, অত্যন্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধর্মঘট পরিচালনার জন্য নতুন সাংগঠনিক ধরন গড়ে তোলাতেও তাঁদের অবদান ছিল। সাধারণ কর্মীদের মধ্যে থেকে নেতৃত্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে কমিউনিস্টরা ব্যাপক ভিত্তিতে নির্বাচিত ধর্মঘট-কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন এবং সেইমতো গড়েও তুলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওই ধর্মঘট-কমিটিগুলি যাতে সংগ্রাম পরিচালনার প্রকৃত সংগঠন হিসাবে কাজ করতে পারে সেই ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করেছিলেন। সচেতন ও জঙ্গী কর্মীদের নেতৃত্বে মিল-কমিটিগুলির পরিচালনাকে ভিত্তি করেই তাঁরা ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিলেন।

দমন-পীড়নের আগাম পদক্ষেপ

এই সমস্ত ঘটনাবলী মালিক এবং সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্টই হয়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা তো এক পর্যায়ে মিল-কমিটি গঠন ও সেভিয়েত গঠনকে সমতুল্য জ্ঞান করত। দেওয়ালের লিখনটি সাম্রাজ্যবাদীদের নজরে পড়েছিল। তারা জানত, কমিউনিস্টরা তখনও সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তবে বুঝত যে, রেলওয়ে ইউনিয়নসহ বড়ো বড়ো শক্তিশালী ইউনিয়নগুলির উপর এদের প্রচুর প্রভাব। কিন্তু কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আবেদন শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে যে সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল তাতেই তারা ভীত হয়ে পড়েছিল। মে দিবস উদ্‌যাপন খুব দ্রুতগতিতে শ্রমিকদের অগ্রগামী অংশের সমবেত হবার একটা ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। বছরখানেক বাদেই জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠবার কথা তারই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মিলনকে

Scanned with CamScanner

ঠেকাবার জন্য অতএব ব্রিটিশ সরকার শ্রমিকশ্রেণীর উপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম আক্রমণ ঘটল ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে। ওই সময়ে সমস্ত সুপরিচিত কমিউনিস্ট নেতা সহ ৩১ জন ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক ও যুব নেতাদের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করা হলো। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশরাজের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল। শ্রমিক, কৃষক এবং যুবকদের মধ্যে যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাঁরা চালিয়েছিলেন এটা অবশ্য তারই পরোক্ষ পুরস্কার।

ধর্মঘট সংগ্রামের বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভ্যুত্থান তাকে দমন করবার জন্য অন্যান্য দমনপীড়নের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল। ভারতে কমিউনিস্ট কার্যকলাপকে খর্ব করবার উদ্দেশ্যে ১৯২৮ সালে সরকার এক জননিরাপত্তা বিল পেশ করেছিলেন। ১৯২৯ সালে আইনসভার বিলটি প্রত্যাখ্যাত হলো বটে, কিন্তু পরে এটাই বিশেষ জরুরি আইন হিসেবে জারি করা হয়েছিল। সালিশী ব্যবস্থার প্রবর্তন, সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ ও অত্যাবশ্যকীয় সংস্থায় ধর্মঘটের অধিকার সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে এক ট্রেড ডিসপিউট অ্যাক্ট পাস করা হয়েছিল। ঘটনাবলীর যে অগ্রগতি কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রামের প্রতি সমর্থনে সমস্ত শিল্প জুড়ে এক সাধারণ ধর্মঘটের দিকে মোড় নিতে চলেছিল তার অনুধাবনেই এই প্রচেষ্টা। কমিউনিস্ট পার্টি তাদের ধ্যান-ধারণাগুলির প্রচার শ্রমিকদের মধ্যে চালিয়ে যাচ্ছিল এবং তার ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি আরো বিশেষ করে, রেলওয়ে ইউনিয়নগুলির মধ্যে তার প্রভাবের যে বৃদ্ধি ঘটছিল এই ব্যাপারটা সরকারী মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল।

ব্রিটিশ সরকার অন্যান্য বিবেকবর্জিত উপায়ও অবলম্বন করেছিল। মীরাট মামলার গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে, ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বোম্বাইতে এক অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেল। এই ঘটনায় সরকারের যে হাত ছিল কমিউনিস্ট নেতারা সেটা ফাঁস করে দিয়েছিলেন। মাসের পর মাস ধরে সাধারণ সংগ্রামের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলিম শ্রমিকদের যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল তাকে ভেঙে ফেলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কমিউনিস্ট নেতারা চেষ্টা করেছিলেন যাতে এই কু-মতলবটির মুখোশ খুলে দেওয়া যায় এবং তার প্রতিক্রিয়াকে সীমিত করা যায়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্টদের আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যেই এই দাঙ্গাকে ব্যবহার করেছিল এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আরো দমন-পীড়নের ব্যবস্থা গ্রহণের সপক্ষেই ওকালতি করেছিল। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বোম্বাই দাঙ্গা তদন্ত কমিটি সুপারিশ করেছিল যে "বোম্বাইয়ে কমিউনিস্ট কার্যকলাপের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাই সরকারের উচিত।" এই তদন্ত কমিটি এই প্রশ্ন তুলেছিল যে, "রেজিস্টার্ড ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা থেকে কমিউনিস্টদের বাদ দেওয়ার" মর্মে একটি সংশোধনী ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট-এ কেনই বা আনা উচিত হবে না।

Scanned with CamScanner

বিগত ১৯২৯ সালে নাগপুরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনকালে সরকার-ঘেঁষা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের পক্ষ থেকে আর এক দফা আঘাত হানা হয়েছিল। শ্রমিক আন্দোলনকে বেকুব বানানোর মতলবে এবং জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে শ্রমিকদের তফাতে রাখতে নরমপন্থী নেতাদের হাতে যেটা এক হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কর্তৃক সেই হুইটলে কমিশন (শ্রম সম্পর্কীয় রাজকীয় কমিশন)-এর প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর এক নতুন ধরনের মেজাজের অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছিল। কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রস্তাবের সঙ্গে সাইমন কমিশন বর্জনের সপক্ষে একটি প্রস্তাবও ঐ অধিবেশনে পাস করা হয়েছিল। হজম করার পক্ষে সরকার ঘেঁষা গোষ্ঠীর নেতৃত্বের কাছে ঐগুলি খুবই বেশি হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা এ আই টি ইউ সি-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন আর এক সংগঠন তৈরি করল এবং এইভাবে বিভেদের সৃষ্টি করল। ব্রিটিশ সরকার কিন্তু তড়িঘড়ি করে এই বিচ্ছিন্ন অংশটিকেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দিল।

মীরাট মামলাকে টেনে হিঁচড়ে বছরের পর বছর ধরে চালানো হলো এবং এক বর্বর দণ্ডাদেশে তার সমাপ্তি ঘটল। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো এবং অন্যান্য কয়েকজনের বারো বছর করে কারাদণ্ড হলো। অবশ্য পরবর্তীকালে হাইকোর্ট কর্তৃক এইসব দণ্ডাদেশ হ্রাস করা হয়েছিল।

এই ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই কমিউনিস্ট ছিলেন না। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক আদালতকে বলেছিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য যদিও তাঁরা শ্রমিক, কৃষক ও যুবকদের মধ্যে কাজ করছিলেন তবে তাঁরা কেউ কমিউনিস্ট ছিলেন না।

আদালতের সম্মুখে কমিউনিস্টদের আচরণ কিন্তু তাঁদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামের প্রতি তাঁদের গভীর আকর্ষণ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের জন্য তাঁরা আদালতের মঞ্চটিকে ব্যবহার করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় কায়েমী স্বার্থবাদীদের কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারকে খণ্ডন করে তাঁরা অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছিলেন। কমিউনিস্টরা আদালতের সম্মুখে একের পর এক উঠে দাঁড়িয়ে এ কথাই বলেছিলেন যে, দেশের মুক্তির জন্য ও তাকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিপ্লব সংগঠিত করবার যে অধিকার তা তাঁদের সহজাত অধিকার।

কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব আন্দোলন যাতে জাতীয় সংগ্রামের মূল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে এই মতলবে তাঁদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক আক্রমণই ছিল মীরাট মামলা ঃ কিন্তু এই আক্রমণ এখানেই থেমে থাকল না। সমগ্র ১৯২৯ সাল জুড়ে একের পর এক ধর্মঘটগুলিকে নির্মমভাবে দমন করা হলো, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিরোধের জাগ্রত ঘাঁটিগুলিকে একের পর এক উৎখাত করা হলো। যে মিল কমিটিগুলি ইউনিয়নের প্রকৃত

Scanned with CamScanner

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করত তাদের দমন করতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া বিগত ১৯২৯ সালের বোম্বাই সুতাকল ধর্মঘটকে যে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল সেটাই ছিল এক বৃহত্তম আঘাত। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে গিরনি কামগড় ইউনিয়ন বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং তা চলে গেল কমিউনিস্ট বিরোধীদেরই দখলে।

বিগত ১৯৩০ সালের সংগ্রামের সময়ে কমিউনিস্টদের একটা সঙ্কটজনক সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এই সংগ্রাম যে সময়ে শুরু হয়েছিল ইতিমধ্যেই অধিকাংশ গণসংগঠন দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তাদের নতুনভাবে গড়ে তুলবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হবার পর এই গণ-সংগঠনগুলিকে কতিপয় গ্রেপ্তারের ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় ও তার ফলে বহু নেতা কর্মক্ষেত্র থেকে অপসৃত হন। এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে বেঠিক ধারণা থেকে উৎসারিত যে ভুল, তা যুক্ত হয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করল যে সুদৃঢ় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীকে গড়ে তুলবার এত বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সত্ত্বেও কমিউনিস্টরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। কংগ্রেস নেতৃবর্গ, রায়পন্থী এবং অন্যেরা এই দুর্বলতার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে কমিউনিস্টদের ভুলকে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়ে তাঁদের নামে জঘন্যতম কালিমা লেপন করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলেন।

সংকীর্ণতাবাদী ভুলের সংশোধন

কমিউনিস্ট পার্টি ও তার আন্দোলনের অগ্রগতিকে দমননীতি দিয়ে আর ঠেকানো যাচ্ছিল না। ইতিপূর্বেকার ভুল সংশোধন করে, জাতীয় নেতৃত্বের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে বিস্মৃত না হয়েও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে একটা সঠিক মনোভাব কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলেছিল। জাতীয় আন্দোলনের অংশ হিসেবে এবং তার একটি সহায়ক অগ্রগামী হিসেবে কাজ করবার জন্য উপযোগী এক কর্মকৌশল তারা গ্রহণ করেছিল। তার অর্থ ছিল ইতিপূর্বেকার প্রতিকূল ধারণাগুলিকে কাটিয়ে তুলবার জন্য ধৈর্য সহকারে কাজ করা। কমিউনিস্টরা কংগ্রেসে যোগদান করলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করলেন না এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁদের বিপ্লবী মনোভাবও বর্জন করলেন না।

ইতিপূর্বেকার বৎসরগুলিতে কংগ্রেসের মধ্যে কর্মরত কমিউনিস্টরা কৃষি সমস্যার প্রশ্নে একটা সঠিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে কংগ্রেসের ধারণাকে পুষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং এভাবে জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে কৃষি বিপ্লবকে যুক্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন। বিগত ১৯২৯ সালের কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেস নেতৃত্বের ডমিনিয়ন স্ট্যাটাসের জন্য দাবির বিরোধিতা করে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংশোধন প্রস্তাবের সপক্ষে চাপ সৃষ্টিতে সুভাষ বসু ও অন্যান্যদের প্রতি কমিউনিস্টরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। একই সঙ্গে, কংগ্রেসের প্রস্তাবে

Scanned with CamScanner

কৃষকদের জরুরি দাবিগুলি অন্তর্ভুক্ত করে নেবার সপক্ষে কমিউনিস্টরা নিজেদের তরফ থেকেও একটা সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কমিউনিস্টদের এই সংশোধনী-প্রস্তাব অবশ্য যথেষ্ট সমর্থন লাভ করেনি এবং পরাজিতও হয়েছিল। কারণ, এমন কি জাতীয়তাবাদী পরিবর্তনপন্থীরাও কৃষক জনগণ থেকে বহুদূরে অবস্থান করতেন এবং কৃষকদের বিপ্লব ও স্বাধীনতার মধ্যে যে জীবন্ত সম্পর্ক সে সম্পর্কে তাঁদের কোন উপলব্ধি ছিল না।

পূর্বেকার এই সূত্র ধরে ১৯৩৫ সালে কৃষক, শ্রমিক ও যুব সংগঠনগুলিকে জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করে দেবার জন্য কমিউনিস্টরা এক প্রস্তাব করেছিলেন যাতে সমস্ত দেশ জুড়ে চাঞ্চল্য জাগানো বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের মিলিত সমাবেশে এই কংগ্রেস একটা প্রশস্ত মঞ্চ হয়ে উঠতে পারে। এই প্রস্তাব অবশ্য প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। কারণ, কংগ্রেস নিজেকেই সমগ্র ভারতীয় জনগণের একমাত্র ও অদ্বিতীয় সংগঠন বলে জ্ঞান করত। বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের অবশ্য তখনকার দিনে জনসাধারণের উপর প্রচুর প্রভাব ছিল এবং সেই প্রভাব অন্যান্য যে কোন গণ-সংগঠনের চেয়ে তাঁদের অনেক বেশিই ছিল।

বিগত ১৯৩০ সালের কংগ্রেসের সংগ্রামের বিপর্যয়ের পরবর্তীকালে দেশ ও বহির্বিশ্বে ঘটনার অগ্রগতি দ্রুতবেগে ঘটে চলেছিল। যদিও ব্রিটিশ সরকারকে প্রায় কিছুই ছেড়ে দিতে হয়নি বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু এই সংগ্রামের একটা ফল এই হয়েছিল যে, কংগ্রেসের মর্যাদা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এ বিপর্যয়ের ফলে জাতীয়তাবাদী সাধারণ কর্মীদের এক অংশের মধ্যে নৈতিক অবসাদ নেমে এসেছিল বটে, কিন্তু অন্যদের মধ্যে কংগ্রেসের নীতি ও ধারণাগুলি সম্পর্কে একটা পর্যালোচনা করে দেখবার তাগিদ সৃষ্টি করেছিল। সময়টা তখন ছিল এই, যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে চাঞ্চল্য জাগানো কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল এবং সারা বিশ্ব জুড়ে নতুন নতুন অনুরাগীদের সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট করছিল। ইউরোপে ফ্যাসিস্টবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠার এবং স্পেনে গৌরবোজ্জ্বল ফ্যাসিস্টবিরোধী গৃহযুদ্ধের কালও ছিল এই সময়টাই। ঘটনাবলীর এই বিকাশের ফলে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি ক্রমবর্ধিষ্ণু আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের ভূমিকা ও তাঁর 'সমাজতন্ত্র কেন?' নামক বইখানি এই প্রক্রিয়াকে খুবই সাহায্য করেছিল। কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির উদ্ভব ছিল তার-ই একটি অংশ। কিন্তু, জাতীয়তাবাদী তরুণ পরিবর্তন-পন্থীরা যেভাবে মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন প্রকৃতপক্ষে তার ফলেই এই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। কমিউনিস্টরা কংগ্রেস সোসালিস্টদের সঙ্গে কাজ করছিলেন এবং অবিলম্বে তার ছাপ তরুণ সমাজতন্ত্রী ও পরিবর্তনপন্থীদের উপর গভীরভাবে পড়েছিল। এসবের ফল এই হলো যে, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি গঠনের পাশাপাশি দ্রুতভাবে কমিউনিস্ট পার্টির বৃদ্ধি ও কমিউনিস্টদের প্রভাবের বিস্তার লাভ ঘটল। মীরাট কমরেডদের মুক্তিলাভের পরে কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টির গঠন এই প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করল। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার প্রবীণ নেতৃবৃন্দ

Scanned with CamScanner

বাইরে ফিরে আসায় কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট প্রভাবকে দৃঢ়তর করেছিল এবং বাংলা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্যে পার্টি দ্রুতবেগে গড়ে উঠতে থাকল। শেষোক্ত রাজ্য দুইটিতে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, জাতপাত-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী—এরকম সমস্ত প্রকার প্রগতিপন্থী ধারা থেকে শক্তি সংগ্রহ করে তাকে ঐক্যবদ্ধ করে কমিউনিস্টরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এটাই ছিল সেই সময়, যখন কংগ্রেসের ভিতর ও বাইরে উভয় দিক থেকেই কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের ভিতরে অবস্থিত বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছিল এবং এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অটল যোদ্ধা হিসেবে নিজেদের এক ভাবমূর্তি অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এর ফলে অবশ্য কতিপয় দুর্বলতাও স্পষ্টতই দেখা দিয়েছিল। পূর্বতন দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে ইউনিয়নগত ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজনবোধ এবং এ আই টি ইউ সি-তে তৎকালে কংগ্রেস সোসালিস্টদের যে প্রাধান্য ছিল সেই ঘটনাদ্বয় একত্রে যুক্ত হওয়ায় সংগঠনে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিকে দুর্বল করে দেবার ঝোঁক দেখা গেল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, বহু সংখ্যক ইউনিয়ন সেই সময়ে এ আই টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এর সদস্য সংখ্যাও হাজারে হাজারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি তখন পর্যন্তও সর্বত্র পৌঁছুতে অক্ষম ছিল এবং তারা নিজেরাও ছিল সংখ্যালঘু। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কংগ্রেস সোসালিস্টরা সর্বহারা শ্রেণীগোত্রীয় ছিলেন না। শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিশেষ ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে বলেও তারা মনে করতেন না। বস্তুত এই শ্রেণীকে তাঁরা বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের নিছক একটা উপাঙ্গ বলেই বিবেচনা করতেন। এই ধ্যানধারণা ও মতাদর্শ যা প্রকৃত পক্ষে পর্যবসিত হতো অর্থনীতিবাদে, এ আই টি ইউ সি-তে তখন তারই ছিল প্রাধান্য। দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এটাই খাপ খেয়ে যেত।

জাতীয় কংগ্রেস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কিত অংশটি প্রত্যাখ্যান করলেও তাঁরা সংস্কার আইনের প্রাদেশিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত অংশটি গ্রহণ করে তদনুযায়ী কাজ করবেন। গণ-সংগ্রামের পরে অবসাদগ্রস্ত জাতীয় নেতৃত্ব এখন যে কাজ করতে সচেষ্ট হলেন তা স্পষ্টতই একটা আপসরফা। কমিউনিস্টরা কংগ্রেস সোসালিস্ট ও অন্যান্য বাম জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে একযোগে এই আইন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যানের সপক্ষে দাবি জানালেন। কারণ ১৯৩০ সালের আন্দোলনকালে পূর্ণ স্বাধীনতাকে যে সংগ্রামের লক্ষ্যবস্তু বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এটা ছিল তার প্রতি এক অবমাননা। কমিউনিস্ট পার্টি সঙ্গতভাবেই এটা আশঙ্কা করেছিল যে, বিশৃঙ্খল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কবলে পড়ে জনগণ তার মোকাবিলায় যখন আর একদফা সংগ্রামের পথ গ্রহণ করতে চলেছেন তখন কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত সেই পথ থেকে কংগ্রেসকে অন্যদিকে পরিচালিত করবে।

সে যা হোক, নির্বাচনে পার্টি কংগ্রেসকেই সমর্থন করল এবং সাম্রাজ্যবাদী ঘেঁষা শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী শক্তির জয় হিসেবেই জনগণের রায়কে তারা অভিনন্দন

Scanned with CamScanner

জানাল। নির্বাচনে জয়লাভকে সাম্রাজ্যবাদী সংবিধানের বিরুদ্ধে যাতে ব্যবহার করা হয় পার্টি সেটাই চেয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট ও বাম জাতীয়তাবাদীরা যার বিরোধিতা করছিলেন, ১৯৩৭ সালে সেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্তই কংগ্রেস করল। ব্রিটিশ প্রশাসন ও আমলাতন্ত্রের অধীনে থেকে এই সংবিধান অনুযায়ী কাজ করতে গেলে জনসাধারণের বিরুদ্ধে যেতে কংগ্রেস বাধ্য। তাছাড়া, এটা অগ্রগামী কর্মীদের পরিবর্তনপন্থী ভাবধারার বিরুদ্ধেও বটে। কিন্তু কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে বসল, তখন এটাকে একটা বিরাট জয় বলে অভিনন্দন জানিয়ে জনগণের একটা ব্যাপক অংশ তাতে সায় দিল।

এই কৌশলের অব্যবহিত ফলশ্রুতি ঘটল কংগ্রেস সরকারকে বিব্রত না করবার ধুয়া তুলে জনসাধারণের অসন্তোষকে চাপা দেওয়া। নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাবের দৌলতে কংগ্রেস নেতৃত্বে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে এভাবে দেখিয়ে দিল যে গণ-অসন্তোষকে নিয়ন্ত্রণে রেখে তারা সাফল্যের সঙ্গেই শাসনকার্য চালাতে পারেন।

এটা যে বারবারই সম্ভব হয়েছিল তা নয় এবং মন্ত্রিসভাগুলির সঙ্গে জনসাধারণের কয়েক দফা সংঘর্ষও ঘটে গিয়েছিল। খ্যাতানামা কমিউনিস্ট নেতা সোলি বাটলিওয়ালার বিরুদ্ধে রাজাগোপালাচারি কর্তৃক রাজদ্রোহ আইনের প্রয়োগের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অন্ধ্রে ও অন্যত্র ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল এবং তার ফলে সরকারকে মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হতে হয়েছিল।

বোম্বাইতে অবস্থা বেশি খারাপ হয়েছিল। একটি মিলের ধর্মঘটের সূত্র ধরে ডাঙ্গে ও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তার করে সুতাকলের জাঁদরেল মালিকদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সরাসরি হস্তক্ষেপ করে বসলেন। মাসের পর মাস ধরে আটক নেতাদের জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। অপরাধী উপজাতি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন করবার জন্য অন্যান্যদের সঙ্গে আর একজন কমিউনিস্ট নেতা সরদেশাইকে গ্রেপ্তার করতেও মন্ত্রিসভা কর্তৃক আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ইউনিয়নের স্বীকৃতির জন্য শর্তাবলীর উল্লেখ করে এই ধর্মঘটকে বে-আইনী ঘোষণা করা ও দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপন করে ও তাকে পাস করিয়ে মন্ত্রিসভা পরিস্থিতিকে আরো বেশি খারাপ করে তুলল। তখনও যেখানে কমিউনিস্টদের শক্তিশালী ইউনিয়ন ছিল সেই সুতাকল শিল্পের ক্ষেত্রে ওই বিল প্রয়োগের জন্যই প্রাথমিকভাবে আনা হয়েছিল। বিলটির উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট প্রভাবকে হটিয়ে দিয়ে একটা সহজে বশ্য ইউনিয়নের আওতায় শ্রমিকদের নিয়ে আসা। যথাযথভাবে রেজিষ্ট্রিকৃত ও স্বীকৃত এই রকম কংগ্রেসী ইউনিয়ন গড়বার ভিত্তি এই আইনের দৌলতে স্থাপিত হয়েছিল। কমিউনিস্টও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি কর্তৃক এই কংগ্রেসী ট্রেড ইউনিয়ন বিলের বিরোধিতা করা হয়। গিরনি কামগড় ইউনিয়ন বোম্বাইয়ের এ আই টি ইউ সি এবং অন্যান্য কতিপয় সংগঠন-এর বিরুদ্ধে একদিনের প্রতিবাদ ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানিয়েছিল। গুলিতে দুইজন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা সত্ত্বেও এই ধর্মঘট হয়েছিল এবং শ্রমিকরা এই কালাকানুনের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। বেকায়দায় পড়ে মন্ত্রিসভা এক দাঙ্গা তদন্ত

Scanned with CamScanner

কমিটি নিযুক্ত করল, আর সেই কমিটি হিংসাত্মক ঘটনাবলীর জন্য যাবতীয় দোষ কমিউনিস্টদের ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে দিল।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্গত চরম বামপন্থী অংশ এবং কমিউনিস্টদের আক্রমণ করতে বুর্জোয়া নেতৃত্ব মন্ত্রিসভার ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছিলেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা সূত্রে দণ্ডিত দীর্ঘমেয়াদী কারাবাস-অন্তে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ডাঙ্গেকেও আবার একদফা জেলে নিক্ষেপ করতে তাঁদের বিবেকে কোনও যন্ত্রণাবোধ ছিল না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবার জন্য বুর্জোয়া নেতৃত্ব মন্ত্রিসভা গঠন করার সময় পর্যন্তও সবুর করেননি। বিগত ১৯৩০ সালের পত্রপত্রিকা মারফত আজগুবি প্রচার ও কমিউনিস্ট-বিরোধী কুৎসামূলক গালগল্প রচনা ছাড়াও, কমিউনিস্টদের রুখতে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারকার্য চালানোর জন্য কংগ্রেস থেকে "গান্ধী সেবা সংঘ" গঠন করা হয়েছিল ঃ গিরনি কামগড় ইউনিয়নের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করবার জন্য এই সঙ্ঘ ব্রিটিশ প্রশাসনের শ্রমবিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। ব্রিটিশ প্রশাসন কর্তৃক এই সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছিল।

একই সঙ্গে, মন্ত্রিসভার দ্বৈত চরিত্রের অভিব্যক্তিও পরিলক্ষিত হয়েছিল। এরা যেমন কমিউনিস্টদের চূর্ণ করে ফেলতে চাইত, অন্যদিকে কিছু অর্থনৈতিক সুবিধাদি দিয়ে শ্রমিকদের তেমনই বশে আনতে চাইত। মন্ত্রিসভা কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি ৮ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির সুপারিশ করেছিল। গিরনি কামগড় ইউনিয়নও একটা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য বলে মনে করত। মন্ত্রিসভাও তৎক্ষণাৎ কমিটির এই সুপারিশকে মেনে নিল এবং তা যাতে কার্যকরী হয় সেটাও দেখেছিল।

এটা লক্ষ্য করবার মতো বিষয় ছিল যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করবার জন্য যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে কিন্তু কমিউনিস্টদের পাশে কংগ্রেস সোসালিস্টদের দেখতে পাওয়া যেত না।

কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টিকেও দ্বৈতভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। একদিকে আমলাতন্ত্র ও কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এই মন্ত্রিসভাকে তাদের সমর্থন করতে এবং মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত ত্রাণমূলক ব্যবস্থাগুলিকে স্বাগত জানাতে হতো ; অন্যদিকে কংগ্রেস সরকার কর্তৃক গণ-আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করবার সচেতন প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে, নিজেদের স্বাধীন উদ্যোগ বজায় রাখতে এবং মন্ত্রিসভা সম্পর্কীয় প্রত্যেকটি সমালোচনাকেই কংগ্রেস বিরোধিতা বলে নিন্দা করবার প্রচেষ্টাকে বাধা দিতে তাদের হয়েছিল। তবে, বিশেষ করে জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে আশা ও মোহে পরিপূর্ণ তৎকালীন ওই পরিবেশে এই কাজটি করা কঠিন ছিল। কিন্তু পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'-এর সহায়তায় পার্টি তার এই ভূমিকা ফলপ্রসূভাবে পালন করতে পেরেছিল। পার্টিকে যে দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে হচ্ছিল সেটা স্মরণে রেখে জনসাধারণকে পরিচালিত করবার জন্য সঠিক নির্দেশ সহ ওই মুখপত্রটি প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করা হতো।

Scanned with CamScanner

জনসাধারণের বৈধ অধিকারের বিরুদ্ধে কয়েক দফায় মুখোমুখি সংঘর্ষে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা নেমেছিল। আহ্‌মেদাবাদের সুতাকল শ্রমিক সম্পর্কিত ঘটনাটি তারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ ; গান্ধীবাদী শ্রেণীশক্তির শক্ত ঘাঁটি এই আহ্‌মেদাবাদ তখন ধর্মঘটে চঞ্চল। শ্রমিকদের দমন করতে বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পাঁচ ও ততোধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারা সেখানে প্রয়োগ করেছিল।

পক্ষান্তরে কানপুরের ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও তার মন্ত্রিসভার এক ভিন্ন রূপ দেখা গিয়েছিল। এখানে ১৯৩৭ সালে কমিউনিস্টরা স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে একত্রে সমস্ত শিল্প মিলিয়ে ৪০ হাজার শ্রমিকের এক সফল ধর্মঘট পরিচালনা করেছিল। মালিকপক্ষ অনমনীয় ছিল, কারণ তাদের একটা বড়ো অংশই ছিল ব্রিটিশ মালিকানা স্বার্থের প্রতিভূ। যুক্ত প্রদেশের ওই ধর্মঘটকে সমর্থন করতে গিয়ে রাজ্যের কংগ্রেস সংগঠন ঘোষণা করেছিল, — "কানপুরের শ্রমিকরা শুধুমাত্র নিজেদের জন্যই সংগ্রাম করছেন না, তাঁরা ভারতের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর জন্যও সংগ্রাম করছেন এবং সংগ্রাম করছেন মানবাধিকারের জন্য।" কমিটি, "যে মহান সংগ্রাম ধর্মঘট শ্রমিকরা শুরু করেছেন তার প্রতি সমস্ত রকমের সাহায্যদান করতে" জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন। দীর্ঘ ৫৫ দিনের সংগ্রাম শেষে ধর্মঘটী শ্রমিকরা জয়লাভ করেছিলেন। এখানে, শ্রমিকদের স্বার্থকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে কমিউনিস্টরা সাফল্য অর্জন করেছিল পরিবর্তনপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহায়তায়।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির হিসাব করে পার্টি ধর্মঘট সংগ্রাম গড়ে তুলবার জন্য আবার এক দফা ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং এক্ষেত্রে তাদের অন্যতম প্রধান সাফল্য অর্জিত হয়েছিল বাংলায় সোয়া দুই লক্ষ শ্রমিকের চটকল ধর্মঘটে। —"ভারতবর্ষ বিপ্লবের পথ সুগম করবার" — উদ্দেশ্যে ধর্মঘট পরিস্থিতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে প্রতিক্রিয়াশীল ফজলুল হক মন্ত্রিসভা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল। ফজলুল হক মন্ত্রিসভার বিরোধী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছিল। কমিউনিস্টরাও অটল থাকলেন।

বাংলার কমিউনিস্টদের কাছে এটাই ছিল একটা সন্ধিক্ষণ। এরপর থেকে রাজ্যের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের তাঁদেরই নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল এবং তাঁদের এ রাজ্যের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সারা ভারত সংগঠনের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

এই সময়টায় যখন জাতীয় কংগ্রেস একেবারে চুপচাপ এবং গণ-সংগ্রামের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণে নারাজ, তখন ট্রেড ইউনিয়ন, কিসান সভা এবং যুবকদের মধ্যে ব্যাপকশক্তি গড়ে তুলবার কাজে কমিউনিস্টরাই ছিলেন কর্মব্যস্ত। তাঁরাই এই সময়ে একটা শক্তিশালী ও স্বতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সক্রিয়তার ভিত্তি তৈরি করছিলেন।

Scanned with CamScanner

কৃষকদের মধ্যে সংগঠন গড়ার কাজ

কৃষকদের সংগঠিত করে তুলতেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলার আসন্ন সংগ্রামে প্রয়োজনে তাঁদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার মান বৃদ্ধি করবার জন্য বহুসংখ্যক পরিবর্তনপন্থী এবং কংগ্রেস সোসালিস্টদের সহযোগিতায় কমিউনিস্টরা কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আমলকে ব্যবহার করেছিলেন। কংগ্রেস কর্তৃক সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নেবার সময় থেকে শুরু করে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার গঠন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর মন্ত্রিসভা থেকে তাঁদের পদত্যাগ পর্যন্ত, —এই অন্তর্বর্তী বৎসরগুলিতে কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব ও তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণে কৃষক আন্দোলন বিরাট পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছিল।

কিসান সভা গঠিত হয়েছিল বিগত ১৯৩৬ সালে। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনকালে তার সদস্য সংখ্যা ৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিগত ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়লাভ ও কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিসভা গঠন এই আন্দোলনে আরো প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং সমগ্র ১৯৩৮ সাল জুড়ে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে কৃষক সংগ্রাম ঘটেছিল। খাজনা বৃদ্ধি, উচ্ছেদ, বাধ্যতামূলক শ্রম ও বেআইনি আদায়ের বিরুদ্ধে এবং খাজনা হ্রাসের দাবিতে, এরকম বহু সংগ্রামে সাফল্যও অর্জিত হয়েছিল। এই সময়ে বিশাল বিশাল কৃষক মিছিল,—কখনও ত্রিশ হাজার, কখনও বা পঞ্চাশ হাজার লোকের মিছিল হতে দেখা গিয়েছিল। কমিউনিস্ট নেতারা যাতে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছেন এমন অনেক কৃষক স্কুলও শুরু হয়েছিল।

এটা ছিল জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটা স্বতন্ত্র গণ-আন্দোলন। কৃষকদের প্রভাবিত করবার একচেটিয়া অধিকার তাঁদের বিঘ্নিত হচ্ছিল বুঝে বুর্জোয়া নেতৃত্ব এ ব্যাপারটি পছন্দ করছিলেন না। ঘটনাটির তাৎপর্য নিহিত ছিল এইখানে যে, কৃষকরা বুর্জোয়া নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী না থেকে এইভাবে সমবেত হতে এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সঙ্গে কৃষি-বিপ্লবের জন্য সংগ্রামকে যুক্ত করতে সুশিক্ষিত হয়ে উঠছিলেন। ভূস্বামীদের চাপের কাছে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি যাতে নতিস্বীকার না করে এই আন্দোলন সেরকম চাপ সৃষ্টি করেছিল।

বিগত ১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত সারা ভারত কিসান সভার গয়া অধিবেশনের প্রস্তাব কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কার্যকলাপ প্রসঙ্গে এবং শাসন সংস্কার আইনের আওতায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কার্যকারিতা সম্পর্কে খুবই সমালোচনামূলক ছিল। তাতে বলা হয়েছিল : " গত বছর এমন একটা বছর গিয়েছে যখন প্রাদেশিক সরকারগুলি থেকে কৃষকরা সামান্যই সুবিধা পেয়েছিল। মানুষের কষ্ট লাঘব করবার ক্ষমতার সুস্পষ্ট অপ্রতুলতা, কায়েমী স্বার্থ কর্তৃক সৃষ্ট এমন সব বৃহত্তর সামনাসামনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা এইগুলি যে কোন মৌলিক কৃষি সমস্যার সমাধানের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অক্ষমতাকে এমন নগ্নভাবে উন্মোচিত করেছিল যে, তাতে এই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অন্তঃসারশূন্যতাকে সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত করে দিল। সামন্ততান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে ভারতের কৃষকদের দৃঢ় সংকল্পের কথা

Scanned with CamScanner

এবং অতীতের যে কোনও সময় থেকে এখন তারা এ সংগ্রামের জন্য যে অধিকতর প্রস্তুত একথা ঘোষণা করতে এই সংগঠন আজ গর্ব বোধ করছে।

প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছিল : "কৃষকদের এই সংগঠন দৃঢ়ভাবে এই অভিমত জ্ঞাপন করছে যে, সেই সময় আজ উপস্থিত যখন কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের জনগণ কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠন এবং সাধারণভাবে জনগণ সহ সমগ্র দেশের ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে খোদ সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীন এই দাসত্বমূলক সংবিধানকে আক্রমণ করবার জন্যে এগিয়ে যাওয়া কর্তব্য। এগিয়ে যাওয়া কর্তব্য পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য, যা শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুবে এক কৃষক-মজুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠায়।"

নতুন পরিবর্তনপন্থীদের নেতৃত্বাধীন কৃষকদের এটাই ছিল কণ্ঠস্বর। এটাই ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের এবং সমগ্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করবার সপক্ষে ভারতীয় জনগণের কণ্ঠস্বর। মাত্র কয়েকমাস বাদেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু, সুতরাং এই আহ্বান যথাসময়েই জানানো হয়েছিল। কৃষকদের মধ্যে এই চেতনাকে একটা রূপ দেবার কাজে কমিউনিস্টরাই অবশ্য ছিলেন সকলে সম্মুখভাগে।

কয়েক মাসের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিসানসভাকে প্রচণ্ড দমন পীড়নের সম্মুখীন হতে হলো। ব্যাপক ধর-পাকড় চলল, নেতা ও কর্মী সকলকেই আটক করা হতে থাকল। এ সব সত্ত্বেও, ঐ বৎসরেই বিহার অন্ধ্র, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও মালাবারে, সিন্ধ এবং সুরম্য উপত্যকায় কৃষকদের সংগ্রাম হয়েছিল স্বেচ্ছাচারী করধার্যের বিরুদ্ধে এবং বলপূর্বক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে।

বিগত ১৯৪০ সালে পালাসায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কিসান সভার অধিবেশনের কালে কৃষকদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মেজাজ চড়তির দিকে ছিল বলে অভিব্যক্ত হয়েছিল। এই অধিবেশনের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল : "এই সভা আরো বিশ্বাস করে যে, একটা বিদেশী সরকারের কর্তৃত্বকে অমান্য করতে এবং দেশের সমগ্র সম্পদ বিদেশে চালান দেবার প্রতিরোধে, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পুরোভাগে থাকবার জন্য বরাবরের মতো জীবনের সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়েও কৃষকরা নিজেরাই শ্রমিকদের সঙ্গে এসে দাঁড়াবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের সভার নেতৃত্বে দৈনন্দিন সংগ্রাম শুরু করতে কৃষকদের অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এই সংগ্রামগুলিই তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে এবং ব্যাপক এলাকা জুড়ে সম্প্রসারিত হয়ে সত্বর এক দেশব্যাপী কর-বন্ধ খাজনা-বন্ধ অভিযানে পরিণত হবে। এবং সেই অভিযানই সাম্রাজ্যবাদীদের এই পরোপজীবী অর্থনৈতিক শক্তির অবসান ঘটাবে ও এদেশে ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতার আসনকে টলিয়ে দেবে।"

এই ঘোষণা এমন সময় করা হয়েছিল, যখন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। কৃষিবিপ্লবের আওয়াজে বলীয়ান হয়ে, কিসান সভার মধ্যে অন্যান্যদের সঙ্গে একই সঙ্গে কর্মরত কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের জন্য কৃষকদের প্রস্তুত করে চলেছিলেন। জনগণের মধ্যেও নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী

Scanned with CamScanner

শক্তি গড়ে তুলতে কমিউনিস্টরা মন্ত্রিসভার আমলকে সুকৌশলে ব্যবহার করেছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যদি এদের প্রতি সাধারণ আহ্বান জানানো হতো, তবে এই জনগণ কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন।

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব শক্তি, তাঁদের দ্বারা পরিচালিত গণসংগঠনসমূহ এবং অন্যান্য পরিবর্তনপন্থী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে একসঙ্গে যে সমস্ত গণসংগঠন তাঁরা পরিচালনা করতেন, সেই সমস্তগুলি একত্রে মিলেমিশেও সারাভারতব্যাপী জনগণের মধ্যে সাড়া জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এরকম এক সাড়া জাগানোর সহায়ক একমাত্র জাতীয় কংগ্রেস-ই হতে পারত। কারণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা তাঁদেরই ছিল এবং জনসাধারণের দৃষ্টিতে তাঁরাই দেশের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করতেন।

শ্রমিকশ্রেণী ও তাঁদের পার্টির এই দুর্বলতাই এখন মারাত্মক প্রমাণিত হলো। কমিউনিস্টরা তাঁদের গণসংগঠনগুলি নিয়ে এই লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়তে তখন প্রস্তুত। কিন্তু যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে গণসংগ্রামের জন্য জনগণের প্রতি কোন আহ্বান কংগ্রেসের কাছ থেকে এল না। কংগ্রেস নেতৃত্বের অনুসৃত নীতির ফলে নিষ্ক্রিয় জনগণের প্রধান অংশটিই এইভাবে আন্দোলনের প্রবাহের বাইরে পড়ে রইলেন।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতায়

যে সব জায়গায় তাঁদের প্রভাব ছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি নীতিনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত কমিউনিস্টরা সেখানেই জনগণকে আন্দোলনের পথে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হলেন। যুদ্ধ ঘোষিত হবার কয়েকটা দিনের মধ্যেই ১৯৩৯ সালের ২রা অক্টোবর তাঁরা যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ হিসাবে বোম্বাইয়ে একটি ধর্মঘট সংগঠিত করেছিলেন। এ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিলেন ৯০ হাজার শ্রমিক। বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধবিরোধী ধর্মঘট। ধর্মঘটী শ্রমিকদের জনসভায় যে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতে ঘোষণা করা হয়েছিল : "সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক এই চরম বিধ্বংসী যুদ্ধে যাদের টেনে-হিঁচড়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেই আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও বিশ্বের জনগণের প্রতি এই সভা সংহতি জ্ঞাপন করছে। এই সভা বর্তমান যুদ্ধকে শ্রমিকশ্রেণীর আর্ন্তজাতিক সংহতির প্রতি এক চ্যালেঞ্জ বলে গণ্য করছে এবং ঘোষণা করছে যে, মানবতার বিরুদ্ধে এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে পরাজিত করাই হবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক ও জনসাধারণের কর্তব্য।"

জনসাধারণের স্কন্ধে যুদ্ধের বোঝা চাপানোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টিতে কমিউনিস্টরাই সর্বপ্রথমে এগিয়ে এসেছিলেন। বিগত ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে বোম্বাইয়ে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ১ লক্ষ ৭ হাজার সুতাকল শ্রমিকের এক ধর্মঘট সংগঠিত করবার মাধ্যমে তাঁরা এই প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেন। যুদ্ধের দরুন জিনিসের দর তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনধারণের ব্যয় প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়েছিল, অথচ এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যায় এমন কিছুই তাঁরা পেলেন না। ভারত সরকারের

Scanned with CamScanner

অর্থনৈতিক উপদেষ্টার তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসের সূচককে ১০০ মাত্রা ধরা হলে, প্রাথমিক পণ্যের দরের সাধারণ সূচক ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৭ মাত্রা হয়েছিল। যুদ্ধ শুরু হবার ৩ মাসের মধ্যেই জিনিসের দর ৩০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে গিয়েছিল। অথচ মানুষকে বাঁচাতে কংগ্রেস এক ইঞ্চিও নড়বেন না। যুদ্ধের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম না করে এবং শুধুমাত্র কিছু চাপ সৃষ্টি করে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে একটা আপসমীমাংসায় উপনীত হবার আশায় তাঁরা তখন ছিলেন।

শ্রমিকদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং ধর্মঘটী শ্রমিকদের নেতৃবৃন্দের পাইকারী হারে গ্রেপ্তার সত্ত্বেও বোম্বাইয়ের এই ধর্মঘট ৪০ দিন স্থায়ী হয়েছিল। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত বোম্বাই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একদিনের সংহতিজ্ঞাপক ধর্মঘটের ডাক দিলে এই উপলক্ষে ১৯৪৯ সালের ১০ই মার্চ বিভিন্ন শিল্পের ৩ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বোম্বাই ধর্মঘট সমস্ত দেশব্যাপী ধর্মঘটের এক তরঙ্গের সূচনা করেছিল। কমিউনিস্টদের তাই আবার শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতে দেখা গেল। যে কানপুরে বিগত ১৯৩৭ সালের ধর্মঘটের মাধ্যমে সুতাকল ইউনিয়নের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন ; সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ২০ হাজার সুতাকল শ্রমিকের ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল। কমিউনিস্টদের উদ্যোগে শুরু বোম্বাই, কানপুর ও কলকাতার ধর্মঘট (মহার্ঘভাতার দাবিতে কলকাতা পৌরসভার ২০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করেছিলেন) সারা ভারত জুড়ে ধর্মঘট সংগ্রামের ঢেউ ছড়িয়ে দিল। আর সেই সংগ্রামের অঙ্গীভূত হলেন বাংলা ও বিহারের চটকল শ্রমিকরা, আসামে ডিগবয়ের তৈল শ্রমিকরা, ধানবাদ ও ঝরিয়া কয়লাখনি শ্রমিক, জামশেদপুরের ইস্পাত শ্রমিক এবং বিভিন্ন শিল্প সংস্থা ও শিল্পকেন্দ্রের বহু সংখ্যক শ্রমিক ভ্রাতৃবৃন্দ। যুদ্ধের বোঝা চাপানোর বিরুদ্ধে দেশে বড়ো রকমের এক প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল, অথচ পাছে আপসমীমাংসার সম্ভাবনা বিঘ্নিত হয় এই ভয়ে ভীত জাতীয় কংগ্রেস একটুও নড়তে চাইল না।

কিন্তু এই সময়েই কমিউনিস্ট পার্টির উপর নেমে এল এক অবশ্যম্ভাবী আঘাত। পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' এবং বোম্বাই থেকে প্রকাশিত রাজ্যের পার্টি মুখপত্র 'ক্রান্তি'-কে নিষিদ্ধ করা হলো। সারা দেশজুড়ে অন্যান্য পরিবর্তনপন্থী সমেত কমিউনিস্টদের ধরপাকড় করা হলো। পার্টি পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়ে গেল এবং তার কাজকর্ম আত্মগোপন অবস্থাতেই চালাতে হলো। প্রায় পাঁচ শত কমিউনিস্ট কর্মী ও নেতাকে বিনাবিচারে আটক করা হলো। বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে দণ্ডিত হলেন, ৬,৪৫৬ জন এবং ১,৬৬৪ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে বহিষ্কার বা অন্তরীণ করা হলো কিংবা তাঁদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হলো। উল্লিখিত পরবর্তী সংখ্যাটির মধ্যে কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য পরিবর্তনপন্থীরা উভয়েই ছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদীদের এই আক্রমণের পাশাপাশি, কমিউনিস্টদের উপর কংগ্রেস সোসালিস্ট নেতৃত্বের আক্রমণও চলেছিল। এই পেটি-বুর্জোয়া সোসালিস্ট গ্রুপের মধ্যে কিছুকাল যাবতই একটা কমিউনিস্ট-বিরোধী ঝোঁক দানা বেঁধে উঠছিল এবং এখন তা

Scanned with CamScanner

অভিব্যক্ত হতে থাকল তাদের দল থেকে কমিউনিস্টদের ও তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের এবং দ্বিমতপোষণকারীদের বহিষ্কার করে দেবার মধ্য দিয়ে।

দীর্ঘ দুই বৎসর ধরে কমিউনিস্টরা আত্মগোপন অবস্থায় একলাই লড়াই চালিয়ে গেলেন। অথচ জাতীয় নেতৃত্ব একেবারে চুপচাপ বসে রইলেন। যুদ্ধ শুরু হবার এক বৎসর পরে বিগত ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে, এই নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের ফলে বাধ্য হয়ে কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে অত্যন্ত সীমিত ধরনের এক সংগ্রামে সম্মতি জানাল। তাঁদের অনুমোদিত এ সংগ্রাম স্বাধীনতার জন্য ছিল না। তা ছিল বাক্-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য একটা প্রতীক 'সত্যাগ্রহ' মাত্র। এর জন্য আইন প্রতিরোধকারীদের একটা তালিকা পরীক্ষা করে দেখা ও অনুমোদনের প্রয়োজনে গান্ধীজীর কাছে পাঠাতে হতো। তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তিদের তখন কোথায় এবং কখন এই প্রতীক যুদ্ধ-বিরোধিতা প্রদর্শন করবেন, তা কর্তৃপক্ষকে পূর্বাহ্নেই জানাতে হতো। এই যুদ্ধ-বিরোধী সংগ্রামের একটা প্রহসন বৈ কিছুই ছিল না। এক বছর ধরে বিধিনিষিধের গণ্ডীতে আবদ্ধ বিক্ষুব্ধ মানুষ কিন্তু তা সত্ত্বেও হাজারে হাজারে এসে কারাবরণ করলেন।

জনযুদ্ধ

বিগত ১৯৪১ সালের জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলারের আক্রমণে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে একটা সুগভীর পরিবর্তন ঘটে গেল। যুদ্ধের চরিত্রগত এই পরিবর্তনের ব্যাপারটা বুঝতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কিছুটা সময় লেগে গিয়েছিল। কিছুদিন পর্যন্ত এরকমটাই মনে করা হয়েছিল যেন অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তনই ঘটেনি। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে পার্টি এই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ফ্যাসি-বিরোধী জোটের জয়লাভ বিশ্বের জনগণের স্বার্থের সপক্ষে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থের সপক্ষে। কারণ তা বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে এত দুর্বল ও হতোদ্যম করে দেবে যে, ভারতকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। বিশ্বের শক্তিসমূহের বিন্যাসের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছিল, এটা ছিল তারই সঠিক উপলব্ধি। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবর্গ বাম জাতীয়তাবাদী সহ অন্যান্য জাতীয়তাবাদী তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টি এখন যুদ্ধকে তাই জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করল, যে যুদ্ধে জয় অর্জন করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ পরিচালনার কাজে বাধা সৃষ্টি বার্লিন-রোম-টোকিও অক্ষশক্তির পরাজয়কেই বিঘ্নিত করত। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, ফ্যাসিস্ট শক্তিত্রয়ের পরাজয় বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে এসে দাঁড়ানো ছাড়া যাদের আর কোনও উপায় ছিল না, সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কিছুতেই পরিস্থিতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না।

ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দিয়ে কমিউনিস্টরা একথাও বুঝেছিলেন যে, জনযুদ্ধে অর্জিত জয়

Scanned with CamScanner

ভারতীয় সমাজের সমগ্র শক্তির উদ্যমকে শৃঙ্খলমুক্ত করে দেবে এবং তাঁকে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র শেষ সংগ্রামে লিপ্ত করবে। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, এ যুদ্ধের শেষে ভারতের জনগণ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবেই সম্মুখপানে এগিয়ে চলবেন।

পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, কমিউনিস্টদের ধারণা সম্পূর্ণভাবেই সঠিক ছিল। এ যুদ্ধের শেষে একটা নতুন যুগের সূচনা পরিলক্ষিত হলো। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় সমাজতন্ত্রবাদ কায়েম হলো, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল এবং ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশশাসকরা সরে পড়তে বাধ্য হলো। যুদ্ধে বিজয়ী ব্রিটিশ ফৌজ ভারতীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে কোন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে যেমন আর ইচ্ছুক ছিল না, তেমনই সক্ষমও ছিল না।

সুবিধাবাদী বিশ্বাসঘাতকতা

এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে একটা আপস করে ফেলবার সুযোগ পেয়ে বুর্জোয়া নেতৃত্ব অবশ্য যুদ্ধোত্তর গণ-অভ্যুত্থানকে পরিচালনা করতে অস্বীকার করল এবং কৃষি বিপ্লবের প্রতিবন্ধকতা করে জনগণকে প্রবঞ্চিত করল। তখনও পর্যন্ত জনসাধারণ যে বুর্জোয়া নেতাদের উপর আস্থা স্থাপন করে রেখেছিলেন, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ উন্মোচন না করেও জমিদারদের স্বার্থের ক্ষতি না করে সাম্রাজ্যবাদীদের নিষ্ক্রমণ সুনিশ্চিত করতে তৎকালীন আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর বিকাশ তাঁদের কাজে লেগেছিল। এই দরকষাকষির সময়ে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান দেশবাসীর ভ্রাতৃঘাতী হত্যাকাণ্ডের এবং দেশবিভাগের ক্ষতি জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। তাদের আপসরফার এই কুফল এখনও ভারতীয় জনগণকে ভোগ করতে হচ্ছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের চরিত্র ছিল সাম্রাজ্যবাদী এবং যে সময়ে তার বিরোধিতায় দাঁড়িয়ে দেশের স্বাধীনতার দাবিতে নিজস্ব ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত ছিল, সেই সময় কংগ্রেস কিন্তু এক ইঞ্চি নড়তে সম্মত হয়নি। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কংগ্রেস হঠাৎ একেবারে জঙ্গী হয়ে উঠল এবং ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' — সংগ্রাম শুরু করে দিল। শত শত মানুষ জীবন বিসর্জন দিলেন, হাজার হাজার মানুষ কারাবরণ করলেন। কিন্তু প্রকৃতিগত কারণেই এই ক্ষিপ্রগতি ও স্বল্পায়ু সংগ্রাম ইতিহাসের প্রবাহের বিরুদ্ধে গিয়ে ভারতীয় জনগণকে বেকায়দায় এক আঘাটাতে নিয়ে গিয়ে ফেলল এবং তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

মুসলিম জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা

এই সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্রভাবে কংগ্রেস সংগঠনের এমন একটা মারাত্মক দুর্বলতা উদঘাটিত করে দিল, যার সম্পর্কে কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে বহুবার সমালোচনা

Scanned with CamScanner

করা সত্ত্বেও তাঁরা সেটা স্বীকার করতে সম্মতি হননি। সেই দুর্বলতাটি হচ্ছে, কতিপয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড এলাকা ছাড়া সর্বত্রই মুসলিম জনগণ থেকে কংগ্রেস সংগঠনের বিচ্ছিন্নতা। বস্তুত এটা এমন একটা সামগ্রিক আকারের বিচ্ছিন্নতা, যা বছরের পর বছর ধরে জমে উঠেছিল। এর ফলে মুসলিম জনসাধারণ এই আগস্ট সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে বসল এবং প্রায় একটা বিরূপ মনোভাবই গ্রহণ করল।

বিগত ১৯২০ সালের সংগ্রামের ব্যর্থতার পর থেকেই এই বিচ্ছিন্নতা দিনে দিনে বেড়ে চলেছিল। মুসলিম জনসাধারণের উপর কংগ্রেসের প্রভাব ১৯৩০ সাল নাগাদ অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। বিগত ১৯৩৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মুসলিম আসনসমূহে কংগ্রেস চরমভাবে পরাজিত হলো (১৯৩৭ সালের নির্বাচনকালে সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল)। সাধারণ আসনগুলিতে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। কিন্তু ৪২৮টি মুসলিম আসনের মধ্যে মাত্র ৫৮টি আসনে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন এবং জয়ী হয়েছিলেন মাত্র ২৬টি আসনে (১৫টি আসন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং ১১টি আসন অবশিষ্ট ভারতে)

যদিও মুসলিমরা বহু গোষ্ঠী ও অংশে নিজেরা বিভক্ত ছিলেন এবং মুসলিম লীগ মাত্র ৪.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, তা সত্ত্বেও কংগ্রেস চূড়ান্তভাবে হেরে গিয়েছিল। শীঘ্রই সমগ্র মুসলিম ভোট লীগের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গেল। মুসলিম জনগণকে কাছে টেনে নেবার জন্য লীগের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসবার সপক্ষে কমিউনিস্টরা বহুবার নিজেদের অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন কিন্তু মুসলিম জনসাধারণ যে সম্পূর্ণভাবে লীগের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছিল, সে কথাটা কংগ্রেস শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বীকার করতে অসম্মত ছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যেই এই বাস্তব সত্যটিকে স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ সংগ্রামের স্বার্থে কংগ্রেস-লীগ সমঝোতা গড়ে তুলবার জন্য বলেছিল। জনযুদ্ধ চলাকালেই, এ যুদ্ধকে সমর্থন করবার সঙ্গে সঙ্গে একটি জাতীয় সরকার — কেন্দ্রে একটি কংগ্রেস-লীগ সরকার গঠনের দাবি পার্টি করেছিল। ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টা যাতে ব্রিটিশ আমলাদের হাতে না থাকে এবং ক্ষমতার কেন্দ্রে যাতে জনগণের প্রতিনিধিরাই থাকতে পারেন—এ দাবি সেজন্যই করা হয়েছিল। যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানিয়ে উক্ত দুইটি সংগঠন যদি এই দাবি করতে পারত তবে তাকে বাধা দেবার মতো কোন অবস্থা যে ব্রিটিশ সরকারের ছিল না, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে যাই হোক, ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত করে তুলবার অথবা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বার্থে কংগ্রেসকে সাহায্য করবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ লীগ নেতৃত্বের ছিল না।

বিগত ১৯৪০ সাল নাগাদ হিন্দু-মুসলিম সমস্যাটি এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে মুসলিম লীগ কর্তৃক পাকিস্তানের জন্য দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল। হিন্দুদের

Scanned with CamScanner

আধিপত্য সম্পর্কে মুসলিম জনগণের মধ্যে যে ভীতি তার সুযোগ গ্রহণ করে এটা স্পষ্টতই ছিল বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য একটা দাবি। যার মধ্যে মুসলিম জনগণেরও ঐকান্তিক স্বার্থ নিহিত ছিল, সেই কৃষি-বিপ্লবের আওয়াজের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান জনগণের ঐক্য গড়ে তুলেই একমাত্র এ থেকে পরিত্রাণের পথ পাওয়া যেত। কিন্তু কংগ্রেস অথবা মুসলিম লীগ, এদের কারও নেতৃত্বের সঙ্গেই এ ব্যাপারে কোন সম্পর্ক ছিল না।

প্রকৃত প্রশ্ন তখন ছিল এটাই যে, পাকিস্তানের আওয়াজের সম্মুখীন হয়ে ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ রাখবার কোন বাস্তব সম্ভাবনা ছিল কি না! আধিপত্য সংক্রান্ত তাঁদের ভীতির নিরসন ঘটিয়ে একত্রে বসবাস করবার জন্য মুসলিম জনগণের কাছে কিছু বলা যেত কি? বৈষম্যমূলক আচরণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে সুনিশ্চয়তাদানে সেই পর্যায়ে তখন একটাই মাত্র উপায় ছিল এবং সেটা ছিল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলির জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া। তখনকার পরিস্থিতিতে একটা বাস্তব পন্থা হিসাবেই কমিউনিস্ট পার্টি এই অধিকারের প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেছিল। তবে প্রশ্নটিকে তখন একটা বিজ্ঞানসম্মত তাত্ত্বিক ভিত্তিতে দাঁড় করাবার প্রচেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সপক্ষে বলতে গিয়ে কমিউনিস্টরা অবশ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সমর্থনে অভিমত জ্ঞাপন করেননি। একত্রে বসবাসের যাতে সুযোগ থাকে সেজন্যেই এই অধিকারের কথা বলা হয়েছিল এবং ঈপ্সিত ফললাভের প্রচেষ্টা হলে তবেই একমাত্র সেই অধিকার প্রয়োগের প্রশ্নটি ছিল।

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অব্যবহিত আশঙ্কাকে ঠেকাতে এ ছাড়া প্রতিকারের জন্য কোন উপায় ছিল না। মুক্ত ও স্বাধীন ভারতের অংশ হিসেবে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে বলপূর্বক ধরে রাখা অসম্ভব ছিল। বস্তুত এটা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে, পাকিস্তান দাবির প্রশ্নে যতকাল মীমাংসা না হচ্ছে, ব্রিটিশ শাসকরা ততকাল এদেশের উপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম।

কংগ্রেস এই বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েছিল যে, বড় বড় আঞ্চলিক ইউনিটগুলিকে জোর করে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রাখা যাবে না। বিগত ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে গৃহীত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক প্রস্তাবে বলা হয়েছিল ঃ "তৎসত্ত্বেও কমিটি এই মর্মে ঘোষণা করেছে যে, নিজেদের ঘোষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন আঞ্চলিক ইউনিটের জনগণ কি ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে থাকতে বাধ্য করবার কথা তারা চিন্তা করতে পারে না।"

এটা স্মরণে রাখতে হবে যে, এই পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকারের উপর ভরসা করে লীগ নেতৃত্ব দেশবিভাগের জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়ে উঠেছিল। মুসলিম জনগণের ভীতির প্রশ্নটিকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং এ সম্পর্কে একটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে কংগ্রেস মুসলিম লীগের প্রভাবকে কিছু পরিমাণে খর্ব করতে পারত। মুসলিম জনগণের মধ্যে একটা প্রবল ব্রিটিশ বিরোধী জনগণের প্রবাহ সৃষ্টি হওয়ায় এ সুযোগকে নিকটতর

Scanned with CamScanner

করেছিল। যুদ্ধশেষে যখন মুসলিম সৈন্য, নৌবাহিনীর শিক্ষার্থী ও বিমান বাহিনীর লোকরা অন্যান্যদের সঙ্গে একসঙ্গে ব্রিটিশবিরোধী পতাকা তুলে ধরেছিলেন, যখন বোম্বাই শহর ও অন্যান্য জায়গায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে রুখতে মুসলিম জনসাধারণ ব্যারিকেড গড়ে তুলেছিলেন, তখন এই ঘটনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সুভাষ বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অফিসারদের বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কলকাতা ও অন্যান্য শহরে তাঁরা হাজারে হাজারে এগিয়ে এসেছিলেন। ব্রিটিশ শাসকদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে দৃঢ়সংকল্প, এমন কিছু খ্যাতনামা মুসলিম অফিসার নিজেরাই এই আই এন এ-কে পরিচালনা করেছিলেন। যুদ্ধোত্তর এই গণঅভ্যুত্থানে লীগের মতো কংগ্রেসও ভীত হয়ে উঠেছিল এবং এই নেতারা আলাপ-আলোচনার জন্য ব্যস্ত হয়ে দেশ বিভাগকে অবশ্যম্ভাবী করে তুললেন।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমর্থন করে কমিউনিস্ট পার্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অব্যবহিত বিপদকে এড়াতে চেষ্টা করেছিল। আর, কংগ্রেসী কৌশল সেই বিচ্ছিন্নতাকে অনিবার্য করে তুলেছিল। এ কথা বলা হচ্ছে না যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারটুকু মেনে নিলেই বিচ্ছিন্নতাকে কংগ্রেস ঠেকাতে পারত। কারণ লীগ নেতৃত্ব ছিল একটা বিরাট বাধা। সমস্ত বাধা ভেঙে মুসলিম জনগণের কাছে পৌঁছুতে পারলেই একমাত্র দেশবিভাগকে ঠেকানো যেতে পারত এবং এক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ব্যাপারটি ভারতের আন্দোলনের সম্মুখে দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখবার একটা সুযোগ এনে দিত। কিন্তু মুসলিম জনগণ লীগের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ায়, বিগত ১৯৪০ সাল নাগাদ বিষয়টি খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমাদের দেশের জনগণ সবসময়েই ভারতবর্ষকে এক এবং অবিভাজ্য বলে মনে করতেন এবং তাঁদের কাছে আত্মনিয়ন্ত্রণ বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ধারণাটি দৈব অভিশাপের মতই অবাঞ্ছিত ছিল। তা ছাড়া এই বিশ্বাসে তাঁদের পুষ্ট করা হয়েছিল যে, মুসলিম জনগণের অধিকাংশই কংগ্রেসকে সমর্থন করে এবং মুসলিম লীগ নিছক একটা সাম্প্রদায়িক সংগঠন, যা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। আর একটা ব্যাপার এই যে, কংগ্রেস কখনও তাঁদের ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবটিকে জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করে বলেননি। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের বক্তব্য সম্পর্কে ব্যাপকভাবে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার ফলে জনসাধারণ থেকে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। কমিউনিস্টদের ভূমিকা সম্পর্কে যৎপরোনাস্তি বিকৃত ধারণা প্রচার করতে কংগ্রেস নেতারা এই বিভ্রান্তির সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন।

সে যা হোক, এটা কখনই বলা চলে না যে কমিউনিস্ট পার্টি আত্মনিয়ন্ত্রণের সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছিল বলেই দেশ বিভাগ ঘটেছিল। জনগণের উপর এত বিশাল প্রভাব থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস কেনই বা তা ঠেকাতে পারল না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য আপসের মূল্য হিসাবে কেন তারা এটাকে মেনে নিলেন?

সঙ্গে সঙ্গে এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, সমস্যাটির তত্ত্বগত উপস্থাপনায়

Scanned with CamScanner

কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যে দুর্বলতা ছিল, যা বিভ্রান্তিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে তাদের বাস্তব প্রস্তাবটি সঠিক ছিল এবং প্রকৃত পরিস্থিতির সঙ্গে তা ছিল সঙ্গতিপূর্ণ।

এটা অবশ্যই দেখা যাবে যে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অব্যবহিত বিপদকে প্রতিহত করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের স্বার্থে ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের স্বার্থে এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির সমাধান করে জাতীয় আন্দোলনকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল। লীগ নেতৃবৃন্দ অবশ্যই তৎমুহূর্তেই বিচ্ছিন্ন হওয়া, ব্যতিরেকে অন্য কোন রকম মীমাংসায় সম্মত না হতে কৃতসংকল্প ছিলেন।

'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ঃ আপসের জন্য সংগ্রাম

১৯৪২ সালের ঘটনায় ফিরে আসা যাক। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে যে পরিবর্তন সেটা যে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের গোচরে আসেনি — একথাটা বলা সঠিক হবে না। কংগ্রেসের প্রস্তাবে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধশেষে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় প্রচণ্ড একটা সঙ্কটের বিস্ফোরণ ঘটে। আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের পারস্পরিক বিন্যাস যে ভারতের অনুকূলে আসবে, বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিল, আপস করতে হলে সেটা যুদ্ধ চলতে থাকাকালেই করতে হবে নচেৎ সে সুযোগ একেবারেই হারাতে হবে। অতএব তাঁরা এক ক্ষিপ্ত ও স্বল্পায়ু সংগ্রামের ডাক দিলেন এবং গান্ধীজী আহ্বান জানালেন। — 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।

ব্রিটিশ সরকার একটা প্ররোচনামূলক পন্থায় গান্ধীজীসমেত সমস্ত জাতীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করে বসল। জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং সমস্ত দেশজুড়ে স্থানীয় সংঘর্ষ ঘটতে লাগল। এই সমস্ত সংঘর্ষ ঠেকাতে পুলিস ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক হিংসাত্মক ও বর্বর দমনপীড়ন চালানো হলো। ফলে, বহু লোক মারা গেলেন, বহুজন হলেন আহত।

এক সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে, ৬০,২২৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, ভারতরক্ষা আইনে আটক করা হয়েছিল ১৮,০০০ ব্যক্তিকে, পুলিস ও সামরিক বাহিনীর গুলিতে ৯৪০ জন মারা গিয়েছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন ১,৬৫০ জন। কংগ্রেসের বেশ কিছু সংখ্যক বামপন্থী নেতা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু সম্মুখে কোনও কর্মসূচী না থাকায় নিরবচ্ছিন্ন ও সুদৃঢ় সংগ্রামের পথে জনসাধারণকে পরিচালিত করতে তাঁরা অক্ষম হলেন।

এই সংগ্রাম ও তার ফলাফল ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত নীতিকে কোনভাবে প্রভাবিত করল না। গান্ধীজীকে ১৯৪৪ সালে মুক্তি দেওয়া হলো কিন্তু তাঁর দিক থেকে এখন আর সংগ্রামের কোন কথা শোনা গেল না। যুদ্ধের মধ্যেই শুরু করা হলেও, এই 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' — সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে গেল কেন? প্রথম কারণ, এটা ছিল শুধুমাত্র একটা আপসে উপনীত হবার জন্য সংগ্রাম। যদি বস্তুতই এটা

Scanned with CamScanner

'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' প্রকারের সংগ্রাম হতো, তাহলে একটা রেল ধর্মঘটের ডাক দিয়েই কংগ্রেস সমগ্র প্রশাসনকে একেবারে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারত। কারণ শ্রমিকরা তৎক্ষণাৎ এই আহ্বানে সাড়া দিত। এই সংগ্রামে যে কোনও ঐকান্তিকতা ছিল না, সেটা পরবর্তীকালে বুঝা গিয়েছিল, যখন দেখা গেল, কংগ্রেস কোন সংগ্রাম যে শুরু করেছিল সেই কথাটাই একের পর এক কংগ্রেস নেতারা অস্বীকার করে গেলেন। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল এবং জি বি পন্থ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয়েছিল : "এ আই সি সি অথবা গান্ধীজীর তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন সংগ্রামই শুরু করা হয়নি।" ইতিপূর্বে, বিগত ১৯৪৩ সালে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে গান্ধীজী বস্তুত সেই কথাটাই জানিয়েছিলেন : "সমস্ত ভারত জুড়ে ধরপাকড়ের ব্যাপারে সরকারের কার্যকলাপ এতখানি হিংসাত্মক হয়েছিল যে, কংগ্রেস সম্পর্কে সহানুভূতিশীল জনসমষ্টি নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। নিজেদের উপর এই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার ব্যাপারটিকে কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা চলতে পারে না।"

আপস-আলোচনা শুরু করবার পূর্বেই আগস্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেবার জন্যে ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষ থেকে চাপ ছিল, এই সমস্ত দু-মুখো কথাবার্তা ছিল তারই ফল। আগস্ট সংগ্রাম বহির্বিশ্বের প্রগতিবাদী শক্তিসমূহের সহানুভূতি থেকে যে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, এই উপলব্ধি সম্ভবত এর আর একটা কারণ।

স্বভাবতই, গণরোষের এই সময়টাতে কমিউনিস্টদের কণ্ঠস্বর কারো কানে পৌঁছায়নি এবং অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে এখন তাঁরা জনগণ থেকে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। যদিও জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের নিন্দা করে কমিউনিস্টরা তাঁদের মুক্তি দাবি করেছিলেন এবং যদিও জাতীয় ঐক্যের জন্য আহ্বান জানিয়ে তারা কংগ্রেস-লীগ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন, তবুও হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির প্রসঙ্গে তাঁদের যে সমালোচনা তা জনসাধারণ ও তাঁদের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। এতে বুর্জোয়া নেতৃত্বের ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকেই ঘটনা গড়িয়ে গেল। যুদ্ধোত্তর অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে নিজেদের স্থাপন করতে কমিউনিস্টরা সক্ষম হলেন না এবং ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে আপস আলোচনার ব্যাপারে বুর্জোয়া নেতৃত্বের পক্ষে দেদার সুযোগ মিলে গেল।

নিজেদের আগস্ট সংগ্রামকালীন বিশুদ্ধতার কথা জ্ঞাপন করে, নির্যাতন ভোগজনিত মহিমায় বেষ্টিত হয়ে এবং জনগণের মধ্যে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির দৌলতে নেতৃত্ব এমন একটা অবস্থানে এলেন, যেখানে থেকে তাঁরা নতুন গণঅভ্যুত্থানকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে সক্ষম।

যুদ্ধোত্তর আলাপ-আলোচনা কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান উদ্‌ঘাটিত করে দিল। ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে সঙ্কুচিত করতে ও তাকে আপসে পর্যবসিত করতে ব্রিটিশ সরকার এই সুযোগের সম্পূর্ণ ব্যবহার করেছিল। ব্রিটিশ

Scanned with CamScanner

শাসকগণও ঐ সময়ে অবশ্য খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। জনসাধারণের গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ঐক্য গড়ে ওঠার ব্যাপারটা তারা লক্ষ্য করেছিল। কংগ্রেস ও লীগ এই উভয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দও এই ঐক্যকে এক বিপদ মনে করে ভীত হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া, যে সব এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয় ছিল এবং কৃষকদের উপর তাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, সেই সব জায়গায় এই গণ-অভ্যুত্থান কৃষি-বিপ্লবের অভিমুখে গতিশীল হয়ে উঠতেও শুরু করেছিল।

কমিউনিস্টরা এই বিকাশোন্মুখ অভ্যুত্থানকে লক্ষ্য করেছিলেন এবং নিজেদের অবস্থা দুর্বল থাকা সত্ত্বেও অংশগ্রহণ করবার জন্য তাঁরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। একাজের দ্রুত সমন্বয়সাধনে ও তাকে একটা ব্যাপক জাতীয় চরিত্র দিতে এই দুর্বলতাই অবশ্য তাদের সম্মুখে একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল একমাত্র পার্টি, যে পার্টি এতে সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করতে সচেষ্ট ছিল এবং জনগণের রোষের এই অভিব্যক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য

কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনতিক্রম্য বাধা সত্ত্বেও যুদ্ধোত্তর অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলিম জনগণ পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। বহুস্থানে বিক্ষোভকারীরা কংগ্রেস ও লীগের পতাকা বহন করে চলেছিলেন এবং অন্যান্য অনেক জায়গায় তাঁরা কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির এই তিন পতাকাই কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী ঘৃণা সাম্প্রদায়িক বাধাকে ভেঙেচুরে ক্রমাগত বেশি বেশি সংখ্যক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিল। কলকাতা, বোম্বাই এবং দেশের প্রধান প্রধান শহরে এই সময়ে বিক্ষোভকারীরা বহু উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে এই তিন দলের পতাকাই বহন করেছিলেন।

শাহনওয়াজ, সেগল এবং ধীলনের মতো আই-এন-এ-র বীর অফিসারদের বিচারের কাঠগড়ায় তুলতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনগণের মনোভাব সম্পর্কে আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত বিশাল বিশাল মিছিল সমস্ত দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত এই ধৃত অফিসারদের মুক্তি দিতে তারা বাধ্য হয়েছিল।

আন্দোলনের ঢেউ অতঃপর শুধুমাত্র অ-সামরিক অধিবাসীদেরই ভাসিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল না, তা সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেও বিস্তৃতি লাভ করল। সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে, বিশেষ করে বিমান ও নৌবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক আকারের ধর্মঘট উদ্ঘাটিত করে দিল যে, ব্রিটিশ কর্তৃত্ব এবং তাদের শক্তির প্রধান অবলম্বনগুলি ভেঙেচুরে কতখানি খান খান হয়ে পড়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর এই মানুষগুলি ধর্মঘটে নেমে পড়েছিল এবং বোম্বাই শহরে বহুবার তিনটি দলের পতাকা কাঁধে মিছিল করে বের হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

বীরত্বপূর্ণ নৌবিদ্রোহ

বিগত ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বোম্বাই, করাচি ও মাদ্রাজে ভারতীয় নৌবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি এক চরম রূপ ধারণ করল। জাহাজগুলির মাস্তুল থেকে ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক অপসারিত করে তার পরিবর্তে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন করা হলো। বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলে নৌবাহিনীর শিক্ষার্থীরা ঐ পতাকা দুটির পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাও বহন করেছিলেন এবং জয় হিন্দ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, হিন্দু-মুসলমান এক হও, আই-এন-এ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, আমাদের দাবি মানতে হবে ইত্যাদি স্লোগান দিয়েছিলেন।

ভারতীয় নৌবাহিনীর এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম জনগণের সমর্থন লাভ করল। নৌবাহিনীর এই অভ্যুত্থানের প্রতি সংহতি জ্ঞাপনে বোম্বাই-এ কমিউনিস্ট পার্টি এক সাধারণ শ্রমিক ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে এই সমর্থনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তিনদিন ধরে এই শহরে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর গুলিগোলা চলেছিল এবং জনগণ কর্তৃক রাস্তায় এর প্রতিরোধে ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয়েছিল। এই তিন দিনে সেখানে আড়াইশত মানুষ প্রাণ দিয়েছিলেন এবং কতজন যে আহত হয়েছিলেন, সেকথা কেউ জানেন না।

"ভারতে, ১৯৪৬ সালের শুরুতে বিকাশোন্মুখ বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে শক্তির বিন্যাস কী ধরনের ছিল তা অবিসম্বাদী স্পষ্টতা নিয়ে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিল বোম্বাইয়ের এই নৌবাহিনী অভ্যুত্থান ও জনপ্রিয় সংগ্রামে পূর্ণ ফেব্রুয়ারি মাসের দিনগুলি। এই সমস্ত ঘটনাবলী এক এক দিক দিয়ে তৎকালীন আন্দোলনের উচ্চতার পরিমাপ, জনগণের সাহস ও সংকল্পের দৃঢ়তা এবং কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতি ব্যাপক গণসমর্থনের বিষয়টা সুস্পষ্ট করে তুলেছিল। সুস্পষ্ট করে তুলেছিল যে, এই আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়েছিল সশস্ত্র বাহিনী পর্যন্ত ও সে কারণে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিও আর নিরাপদ ছিল না। তেমন-ই তা তৎকালীন জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে অনৈক্য ও প্রস্তুতির অভাব এবং তৎপ্রসূত জাতীয় সংগ্রামে তাঁদের নেতৃত্ব দেবার অক্ষমতা ও উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিল।

ঠিক যে সময়ে জনগণ প্রকৃতই আন্দোলনে নেমে পড়েছিলেন, যখন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে উঠেছিল ও কার্যত পরিলক্ষিত হচ্ছিল, যখন এক সাধারণ জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গনে এসে সশস্ত্র বাহিনী ও অসামরিক জনগণ সম্মিলিত হয়েছিলেন এবং যে সময়ে স্বাধীনতা অর্জনে দরজা ঠেলে এগিয়ে এসেছিল সেই সময়েই জাতীয় আন্দোলনের উচ্চতর নেতৃত্বের মনোভাবে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের উচ্চতর শ্রেণীর নেতৃত্ব গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং জনগণের বিরুদ্ধে আইন ও শৃঙ্খলার প্রতিনিধিস্বরূপ নিজেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।"

[আর পি দত্ত লিখিত "ইণ্ডিয়া টু ডে" পুস্তক থেকে]

Scanned with CamScanner

নৌবাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষার নাম করে সর্দার প্যাটেল এই নৌবিদ্রোহের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করলেন। সেই সময়ে গান্ধীজীও "হিংসাত্মক আচরণ"-এর জন্য জনসাধারণের নিন্দা করেছিলেন।

কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব নিজ শ্রেণীর প্রতি অবশ্যই নিমকহারামি করেননি। জাতীয় স্বাধীনতার দাবির পাশাপাশি কস্মিনকালেও তাঁরা কৃষিবিপ্লবের সপক্ষে প্রতিশ্রুতির কোনও উল্লেখ করেননি। সেকালে সমাজতন্ত্রের কথাও কখনও তাঁরা বলতেন না। এখন জমিদারদের সঙ্গে তাঁদের মৈত্রীর সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ না করেই ক্ষমতায় আসবার সম্ভাবনা দেখা দিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করে দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিকাশ যেভাবে ঘটল তাতে এবং প্রতিরোধের পথে জনগণ যাতে অগ্রসর না হন, তা সুনিশ্চিত করতে জনগণের উপর তাঁদের নেতৃত্বের প্রভাব খাটাতে পেরে তাঁদের লাভই হলো। যে যুদ্ধকে সমর্থন করতে তাঁরা অস্বীকার করেছিলেন, সেই যুদ্ধে অর্জিত জয়-ই এখন তাঁদের অক্লেশে ক্ষমতা অর্জনের সহায়ক হয়ে উঠেছিল। তবে হাজার হাজার মানুষকে এ জন্য অব্যবহিত মূল্য দিতে হয়েছিল দেশভাগ-জনিত ভ্রাতৃঘাতী হত্যার আকারে এবং বছরের পর বছর ধরে জনগণকে তার মূল্য দিতে হচ্ছে দারিদ্র্য ও দুর্ভোগের আকারে।

কৃষকদের জঙ্গী লড়াই

বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ এবং সাম্রাজ্যবাদ, উভয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কারণ, ১৯৪৬ সালে যে শুধুমাত্র নৌবিদ্রোহই ঘটেছিল তাই-ই নয়। ঐ সময়ে জঙ্গী লড়াই গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং অনেক জায়গাতেই তার পুরোভাগে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সশস্ত্র ভায়ালার ও পুন্নাপ্রা সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টিই নেতৃত্ব দিয়েছিল। বাংলায় কৃষকদের জঙ্গী তেভাগার লড়াইয়েরও তারাই দিয়েছে নেতৃত্ব। আর তেলেঙ্গানায় এই সংগ্রাম তখন সবেমাত্র এক সশস্ত্র সংগ্রামে বিকশিত হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। এই সশস্ত্র সংগ্রাম কৃষিবিপ্লবের দাবি নিয়ে একটা বিপুল শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারত। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক সংগ্রাম যে কত উচ্চ পর্যায় অবধি উঠতে পারে, এতে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

এই সংগ্রামে কী অর্জিত হয়েছিল? পি সুন্দরাইয়ার কথায় : এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রধানত নালগোণ্ডা, ওয়ারাঙ্গাল এবং খাম্মাম, এই তিনটি জেলার এগারো হাজার বর্গমাইল এলাকার তিন হাজার গ্রামের প্রায় ত্রিশ লক্ষ কৃষক সংগ্রামী গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। এই গ্রামগুলিতে নিজামের স্বৈরাচারের গ্রামাঞ্চলস্থিত স্তম্ভস্বরূপ ঘৃণ্য জমিদাররা তাদের দুর্গম গদিগুলি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এবং কৃষকগণ কর্তৃক তাদের জমিগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। গণ-কমিটির নেতৃত্বে দশ লক্ষ একর জমির পুনর্বন্টন কৃষকদের মধ্যে করা হয়েছিল। জমি থেকে সমস্ত রকমের উচ্ছেদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং জবরদস্তি

Scanned with CamScanner

খাটানোর ব্যবস্থার অবসান করা হয়েছিল। মহাজনী সুদের অত্যধিক হার এবং লুণ্ঠন ব্যবস্থাকে খর্ব করা হয়েছিল। অত্যাচারী বনবিভাগীয় পদস্থ কর্মচারীদের সমগ্র বনাঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং উপজাতীয়গণ ও বনসংলগ্ন এলাকার জনগণ তাদের শ্রমার্জিত ফল উপভোগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তেরো থেকে আঠারো মাস কাল ধরে এই সব এলাকায় সমগ্র প্রশাসন গ্রামের কৃষি কমিটিগুলি কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল। নিজামের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে রাজাকারবাহিনী ও নিজামের পুলিসের সশস্ত্র আক্রমণ থেকে কৃষকদের রক্ষার প্রয়োজন দশ হাজার স্থায়ী গেরিলা বাহিনী জনগণ সংগঠিত করে তুলেছিলেন। লক্ষ লক্ষ কৃষক তাঁদের জীবনে এই প্রথম দিনে দুই বেলা নিয়মিত আহারের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃষকের সংগ্রামী মৈত্রী এবং কৃষি বিপ্লবের এটা ছিল একটা অভিজ্ঞতার পূর্বাভাস।

ব্যাহত না হলে, এ আন্দোলন পূর্বোক্ত অভিমুখেই অগ্রসর হতো। কিন্তু পরিণামে দেশ বিভাগ ঘটে গেলেও মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনার ভিত্তিতেই যে মীমাংসাটা হয়ে গেল, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই।

লক্ষ্য করলে এটা দেখা যাবে যে, জনগণের প্রতি নিষ্ঠায় এবং পশ্চাদপদতা, বেকারত্ব ও সুদীর্ঘ দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে ভারতীয় জনসাধারণের সম্মুখে একটা নতুন পথ যাতে উন্মুক্ত হতে পারে, তার জন্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও কৃষি বিপ্লবের প্রয়োজনবোধের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টি অটল ছিল। জনগণের উপর কংগ্রেস নেতৃত্বের যে প্রভাব তা কাটিয়ে উঠবার উপযুক্ত যথেষ্ট শক্তি তার ছিল না বলেই তাদের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারেনি।

Scanned with CamScanner